কাব্য-মঞ্জুষা

॥ সংক্ষিপ্ত ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ ॥

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, for Higher Secondary Students as a Text Book *on Beng. Poetry.*

Also, approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, and the University of Calcutta, as a Text-Book *for students taking up* Additional Bengali *in their School Final and Intermediate Courses respectively.*

Also, approved as a Text-Book *for the Intermediate and Higher Secondary Courses by the University of Gauhati and the D. P. I., Assam, respectively.*

Also, approved as a Text-Book by the Visva Bharati.

Also, approved as a Text-Book *for the Intermediate Courses by the Utkal University.*

Also, approved as a Text-Book *by the Poona Board of Secondary Education.*

॥ পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ॥

মোহিতলাল মজুমদার

ওরিয়েণ্ট সিটি বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
সেল্‌স ডিপো :: ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট :: কালকাতা ১২

ওরিয়েণ্ট সিটি বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডে-এর
পক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ॥
১২ বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬০
তৃতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬২
চতুর্থ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৬৩
পঞ্চম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৪
ষষ্ঠ সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫
সপ্তম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৬৫
অষ্টম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬
নবম সংস্করণ—জৈষ্ঠ, ১৩৬৭
দশম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৭
দ্বাদশ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮
ত্রয়োদশ—সংস্করণ—মাঘ, ১৩৬৮
চতুর্দ্দশ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৯
পঞ্চদশ সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৯
ষোড়শ সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৭০
সপ্তদশ সংস্করণ—মাঘ, ১৩৭০
অষ্টাদশ সংস্করণ—মাঘ, ১৩৭১
ঊনবিংশ সংস্করণ—শ্রাবণ, ১৩৭২
বিংশ সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৭২
একবিংশ সংস্করণ—পৌষ, ১৩৭৩

মুদ্রক :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

মুখবন্ধ

বহুদিন হইতে একখানি বাংলা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা মনে মধ্যে আছে; কাজটি অতিশয় পরিশ্রম-সাপেক্ষ বলিয়া, এবং অন্যবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, এ পর্য্যন্ত সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছুকাল যাবৎ এই সম্পর্কে আর একটি গুরুতর প্রয়োজন অনুভব করিতে-ছিলাম—সেটা সাহিত্যিকের মনে নয়, মাষ্টারের মনে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার বিষয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি, নানা কারণে, এখনও কার্য্যকরী হইতে পারে নাই; প্রধান কারণ, উপযুক্ত শিক্ষা-গ্রন্থের অভাব; নিজে শিক্ষকতা-কর্ম্মে ব্রতী থাকিয়া এই অভাব যেরূপ অনুভব করিয়াছি, আর কেহ সেরূপ করিয়াছেন কি না জানি না। আমার বিশ্বাস, পাঠ্য-পদ্ধতি (syllabus) যতই সুপরিকল্পিত হউক—ইংরেজী সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যে সুবিধা আছে, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে সে সুবিধা নাই। এ বিষয়ে চেষ্টার অভাব লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু যে কারণে সেই চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না, তাহা চক্ষুষ্মান ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল সঙ্কলন পুস্তকের সাহায্যে স্কুলে ও কলেজে বাংলা কবিতা পঠন-পাঠন চলিতেছে, সেগুলিতে ভাল এবং উচ্চস্তরের কবিতা অনেক থাকে; কিন্তু আমার এই সঙ্কলনের অভিপ্রায় একটু স্বতন্ত্র, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এই পুস্তকে আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সঙ্কলন করি নাই, অথবা কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাই নির্ব্বাচন করি নাই—শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, আমি যতদূর সম্ভব নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি; আমি জানি কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না, সেগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে. এই শিক্ষা—যে কারণেই হউক—শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা করি কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না। যে সকল ছাত্র মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগবশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগে শিক্ষালাভ করিতে আসেন, তাঁহাদের অধিকাংশের অবস্থা দর্শনে বেদনা বোধ করিয়াছি—অনেকের প্রাথমিক শিক্ষাও সুসম্পন্ন হয় নাই, এজন্য আমি এই পুস্তকে যতদূর সম্ভব

শিক্ষকের কাজও করিয়াছি। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-পদ্ধতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি -ইহা কেবল একখানি সঙ্কলন-গ্রন্থই নয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই পুস্তক একখানি আদর্শ নির্ব্বাচন গ্রন্থ নয়—পড়াইবার জন্য একখানি শিক্ষা-গ্রন্থ প্রণয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন কবিতাগুলির নির্ব্বাচনে, কবিগণের নামের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছি—কোন বড় নাম যেন বাদ না যায়; কারণ এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্যই বেশী। এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলিবার আছে। এইরূপ কবিতার নির্ব্বাচনে ব্যক্তিগত রুচির বশবর্ত্তী না হইয়া কালের বিচারই শিরোধার্য্য করা উচিত। তাহা ছাড়া, যে কবিতাগুলি বংশানুক্রমে প্রত্যেক বাঙালী সন্তান পড়িয়া আসিতেছে, সেগুলির সহিত পরিচয় না থাকিলে, সাহিত্যিক সংস্কারই ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য আমি পুরাতন কবিতার নির্ব্বাচনে যথাসাধ্য সেই ঐতিহ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিতার নির্ব্বাচনে, আমি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি—অর্থাৎ, যে কবিতায় কবির নিজস্ব রচনাভঙ্গি ছাত্রগণের পক্ষে সহজেই বোধগম্য হয়· একের সহিত অন্যের পার্থক্য বুঝিতে পারে—সেইরূপ কবিতাই চয়ন করিয়াছি।

কবিতার বিষয় যতটা রকমারি হইতে পারে—সে দিকেও যেমন লক্ষ্য রাখিয়াছি, তেমনি একই বিষয়ে বিভিন্ন কবির রচনা কিরূপ বিভিন্ন হইতে পারে, তাহাও বুঝিবার উপায় করিয়াছি। কবিতার ভাষায় যে কারণে যত বৈচিত্র্য সম্ভব, গদ্যের ভাষায় তাহা ততটা সম্ভব নয়, ছাত্রগণের পক্ষে এই ভাষার বৈচিত্র্য এবং রচনার বিবিধ ভঙ্গি বড়ই শিক্ষাপ্রদ।

কি আদর্শে ও কোন্ অভিপ্রায়ে, এই পুস্তক রচনা করিয়াছি তাহা উপরে সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। এক্ষণে সুধীগণকে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত একবার চোখ বুলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করি; বিশেষতঃ পুস্তকের শেষভাগে আমি ছাত্রগণের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার দিকে সকলের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোহিতলাল মজুমদার

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন

'কাব্য-মঞ্জুষা'র পূর্ব্ব-সংস্করণ শুধুই ছাত্রপাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে নয়—বাংলা কাব্যের একটি আদ্যন্ত পরিচয়মূলক সংক্ষিপ্ত চয়ন-গ্রন্থরূপেও সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইয়াছিল, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশোন্মুখ ছাত্রছাত্রীগণের এবং বাংলা সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠকসমাজেরও উহা সমান কাজে লাগে। ইহার জন্য, শুধুই কবিতা-চয়ন নয়, বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক ধারার ও সেই সঙ্গে কবি ও কবিতার সবিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। একাধারে এই দুই প্রয়োজন সাধন হইবার মত কোন কাব্যসঞ্চয়ন এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও পত্রে ও পত্রিকায় আমি ইহার জন্য যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ইহার প্রতি যতটুকু দৃষ্টি দেওয়া সাধ্য ও সম্ভব তাহা দিয়াছেন—কোন কোন বিশেষ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে (অর্থাৎ সকলের পাঠ্যরূপে নয়) নির্ব্বাচন করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। কিন্তু 'বিশ্বভারতী'র কর্তৃপক্ষগণ যে তাঁহাদের লোক শিক্ষা সংসদে আমার পুস্তকখানিকে সাদর অভ্যর্থনা দান করিয়াছেন, ইহাতেই আমি আর একদিকে আশানুরূপ পুরস্কৃত হইয়াছি; বাংলা দেশের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও আমাকে সেইরূপ পুরস্কৃত করিবেন এই আশা করি। সেই আশাতেই এই সংস্করণটি প্রস্তুত করিয়াছি; কারণ অনেকেই আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইলে, উপরের দুই-শ্রেণীর ছাত্রগণের পক্ষে সকল দিকে সুবিধা হইতে পারে। তাই আমি আমার সেই উদ্দেশ্য পৃথক রাখিয়া, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই সংক্ষিপ্ত স্কুলপাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত করিলাম। অপর উদ্দেশ্যটির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণতর ও বৃহত্তর একটি সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

এই স্কুলপাঠ্য সংস্করণের প্রসঙ্গে আমি পুনরায় দুই-একটি বিষয়ে শিক্ষক-মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের স্কুলগুলিতে যে কারণে বাংলা সাহিত্য-শিক্ষার ব্যবস্থা যেরূপ হওয়া অনিবার্য্য হইয়াছে, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই যতদূর সহজ, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের শ্রমলাঘবের

জন্য এমন কিছু থাকা উচিত যাহা পৃথকভাবে উপদেশ দিবার বা সংগ্রহ করিবার সুযোগ অথবা অবসর থাকে না। আমি কয়েকটি সুসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান স্কুলের কথা বলিতেছি না—অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি—গ্রামের স্কুলগুলির অবস্থা সকলেই জানেন। আমার এই পুস্তক যে সাধারণ পাঠ্য-সংকলন নয়, তাহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। যিনি ইহার আদ্যন্ত ভাল করিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে যেমন একটি পাঠ-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনই এমন টীকা-ভাষ্য যোজনা করা হইয়াছে, যাহাতে ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন হয়, সমালোচনা-শক্তি জন্মে এবং জিজ্ঞাসা ও রসবোধ জাগে। যাহাতে তাহারা অতিশয় ক্ষতিকর ব্যাখ্যা-পুস্তকের শরণাপন্ন না হয়, তজ্জন্য আমি কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রমই করিয়াছি। বাংলাদেশের স্কুলসমূহের পাঠ্যনির্দ্ধারণ যাঁহারা করিয়া থাকেন এবং সেই পাঠ্যও ঘন ঘন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন, আমার এই পুস্তকখানির প্রতি তাঁহাদের যথোচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অলমতি বিস্তরেণ

বরিশা, ২৪ পরগণা
১৫ শ্রাবণ, ১৩৫৭।

মোহিতলাল মজুমদার

। কাব্য-মঞ্জুষা ॥

সূচী

॥ আধুনিক-যুগ ॥

॥ উন্মোচনী ॥

———

॥ পুরাতনযুগ ॥

॥ ১ ॥

প্রার্থনা

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পায়বি
যব তুহুঁ করবি বিচার
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখীকুলে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

বিদ্যাপতি

॥ ২ ॥

হরি বিনা

সখি হে হমর দুখক নাহি ওর
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥

ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবনভরি বরসন্তিয়া।
কান্ত পাহুন বিরহ দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুশিল-কত-শত-পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

—বিদ্যাপতি

॥ ৩ ॥

কৃতাঞ্জলি

মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥

—বিদ্যাপতি

॥ ৪ ॥

সীতার বিবাহ

গলে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইনু শরণ॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুগণ॥

হেন বেশ ভূষণ পরায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী
তোলা জলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী।

চিরুণীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।
চুল বান্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ॥
কপালে তিলক আর নির্ম্মল সিন্দুর।
বালসূর্য্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর॥

নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে॥
চঞ্চল নয়ন কিবা কজ্জলের রেখা।
কামের সমান যেন গুণে যায় দেখা॥

গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলি॥
উপর-হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয়॥

দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥ ২৪

সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী ॥
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি ;
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥ ২৮

পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অবগুণ্ঠন ঘুচাইল যত বন্ধুগণ।
সীতা-রামে পরস্পর হইল দরশন ॥ ৩২

জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥
হস্তে ধরি আনাইল রামেরে তখন।
হস্তে ধরি তোল সীতা বলে বন্ধুজন ॥ ৩৬

স্ত্রীলোকেরা পরিহাস করে ছল পেয়ে।
কেহ বলে হস্তে ধর কেহ বলে পায়ে ॥
পূর্ব্বাপর বর-কন্যা আইল দুই জনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥ ৪০

কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে ॥
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা-বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা-বর লৈল ॥ ৪৪

রাজরাণী গিয়া পরে করিল রন্ধন।
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন ॥
সাজায় বাসরঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে রহেন দুইজন ॥

—কৃত্তিবাস

শ্যাম-সুন্দর

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা ॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজে জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগায়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা সুষম করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

আদলি উপরে কেবা কদলী রোপিল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগে ॥

—চণ্ডীদাস

হতাশের আক্ষেপ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥
সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু—
ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে ॥
নগর বসানু সাগর বান্ধিনু
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুখাল মাণিক লুকালো
অভাগী-করম দোষে ॥

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু ১৬
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
মরণ-অধিক শেল ॥

—জ্ঞানদাস

॥ ৭ ॥

কালকেতুর বিক্রম

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি,
সবার লোচন-সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণ শীল রূপ বাড়া, বাড়ে যেন শাল-কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁঠি,
করযুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ-আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥

দুইচক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী, মাথায় জালের দড়ি,
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল।।
লইয়া ফাউড়া ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে, পড়য়ে ধরণী' পরে,
ডরে কেহ নিয়ড়ে না রয়।।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।।
গণক আনিয়া ধরে, শুভ তিথি শুভ বারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত-করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঝা, ছাড়িতে শিখায় নেজা,
চামের টোপর দেয় শিরে।।

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

।। ৮ ।।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস পাইবে দেখিতে।।

কনকের মৎস্য তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু ছেদিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লব আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করিল অন্তর।
মৎস-চক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য ভেদি হৈল অস্ত্র পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে অস্ত্র আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভামধ্যে হৈল॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখি হতচিত্ত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল রহ রহ যাজ্ঞসেনী॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজ-জাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নিশ্চয়॥

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
কাটি পাড় মৎস যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর তুমি সবে।
মিথ্যা কহি শুভ ফল কভু নাহি লভে ॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্ব্বকাল অন্ধকার নিশি নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥
কতক্ষণ রহিবেক করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব দেখুক সর্ব্বজন ॥
এত বলি অর্জ্জুন লইল ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে ইন্দ্রের কোঙর ॥
সুরাসুর নরগণ দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ॥
অদ্ভুত দেখিয়া তবে যত রাজগণ।
বিস্ময় হইয়া সবে ভাবে মনে মন ॥

জয় জয় শব্দ করে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
আকাশে কুসুমবৃষ্টি করে আখণ্ডল॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদীসুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥

—কাশীরাম দাস

॥ ৯ ॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্ধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে॥
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে, ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

॥ ১০ ॥

ঈশ্বর পাটনী

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বর পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই ॥
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল ॥
যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুই বল ॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধোয়ায়
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায় ॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে ॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত' মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥

তটে উত্তরিলা তরী তারা উত্তরিলা
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা ।।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিলা পাটনী ।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি ।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল ।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ।।
হের দেখ সেঁউতিতি থুয়েছিলা পদ ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঁঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয় ।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ।।
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর ।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার ।
যে দয়া করিলা মোরে এ ভাগ্য উদয় ।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয় ।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে ।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা-অস্টমীতে ।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব ।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাবে দিব ।।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান ।
দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ।।
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহি দেখিতে না পায় ।।

— রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

॥ ১১ ॥

স্বদেশী ভাষা

নানান দেশের নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশী ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারা-জল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?

- রামনিধি গুপ্ত

॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠ পূজা

মন, তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার, কালী ব'লে ব'স্ রে ধ্যানে।
ঝাঁকজমকে কর্‌লে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা
জান্‌বে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা
কাজ কি রে তোর আয়োজনে ?

তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কর আপন মনে।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো
কাজ কি রে তোর সে রোস্‌নাইয়ে ?
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে'
দেও না—জ্বলুক নিশিদিনে !
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোর বলিদানে ?
তুমি—জয় কালী ! জয় কালী ! ব'লে—
বলি দাও ষড়্‌-রিপুগণে
প্রসাদ বলে, ঢাকে ঢোলে
কাজ কি রে তোর—সে বাজনে ?
তুমি, 'জয় কালী, ব'লে, দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

॥ ১৩ ॥

সর্ব্ববাদি-সম্মত স্তোত্র

সকলের পিতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়
সর্ব্ব দেশে পূজ্য তুমি সকল সময় ;
জ্ঞান বা অজ্ঞানী কিংবা সাধু সদাশয়—
কেহ বা যিহোবা, যোব, কেহ প্রভু কয়।
অনাদি-কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত ;
এইমাত্র জানি আমি 'তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়।

যদিও করেছ হেন অবস্থা আমরা,
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার ;
নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন,
তথাচ মানব মন সদাই স্বাধীন।

ধর্ম্মেতে যে করে সাধু কর্ম্মের বিধান,
যে কর্ম্ম করিতে সদা করে সাবধান,
সেই সাধু কর্ম্ম প্রতি মন যেন যায়,
কু-কর্ম্মেতে ঘৃণা হোক নরকের প্রায়।

অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু,
অসন্তোষ তাহাতে না হয় যেন কভু,
তখন মানব রাখে ঈশ্বরের মান,
যখন সুখেতে ভুঞ্জে বিভুদত্ত দান।

ক্ষুদ্র এই ধরাধামে তোমার কুশল,
হেন যেন নাহি ভাবি রয়েছে কেবল ;
মানুষের শুধু তুমি, না করি বিচার—
যেহেতু সহস্র বিশ্ব চৌদিকে তোমার।

যেন এই বোধহীন অজ্ঞানের হাত,
পাপী বোধে কারে নাহি করে দণ্ডাঘাত,
অভিশাপে যেন নাহি মন্দ করি তার,
ভবে যারে ভাবিয়াছি বিপক্ষ তোমার।

ন্যায় পথে থাকি যদি, কর দয়া দান—
চিরকাল করি যা'তে সুখে অবস্থান ;

ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।

তাহে যেন নাহি করি মিছা অহঙ্কার,
করিয়াছ তুমি যত কল্যাণ আমার,
আর অসন্তোষ যেন তাহাতে না হয়,
আমারে যা দাও নাই, ওহে দয়াময়!

পর দুঃখে দুঃখী হ'তে কর উপদেশ,
ঢাকিতে পরের দোষ করহ আদেশ।
সদা যেন সেই দয়া পরেরে দেখাই,
দয়াময়! যেই দয়া চাই তব ঠাঁই

নীচ যদি আমি, ফলে নহি নীচ জীব,
যেহেতু কৃপায় তব রয়েছি সজীব,
আমারে চালাও, নাথ! আপন অধীনে,
বাঁচি কিংবা মরি আমি অদ্যকার দিনে।

অদ্য যেন অন্ন আর শান্তি লাভ হয়,
আর আর বস্তু যাহা রবি-তলে রয়,—
দিতে হয় দাও, নয় কর নিবারণ।
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হোক সম্পাদন।

সমুদয় স্থল হয় তোমার ভবন,
ধরা, সিন্ধু, শূন্য—তব পবিত্র আসন;
করুক একত্রে এরা তব গুণ গান,
রাখুক সকলে মিলি তোমার সম্মান!

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১৪ ॥

ধন সুখ

লক্ষ্মী ছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে।
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

— ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১৫ ॥

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়॥
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়॥
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥

সার্থক জীবন আর, বাহু-বল তার হে,
বাহু বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার ।।
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১৬ ॥

নীতি কুসুমাঞ্জলি

(সংস্কৃত হইতে)

(১)

বায়সের যদি হয় চক্ষুটি সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতি পক্ষে গজমোতি প্রকাশে বিমল-জ্যোতি
তবু কাক রাজহংস নয়।

(২)

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপ-পয় প্রায় তৃষ্ণা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে ?

(৩)

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপে লক্ষ্মীর আগমন ॥
গজভুক্ত কথবেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন। ১২

(৪)

অনলে শীতল হয়, সলিল-সম্পাতে।
ছত্রে ভানু কর, করী অঙ্কুশ-আঘাতে ॥
গো-গর্দ্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি, মন্ত্রে গরল নিবারে ॥ ১৬
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে ॥

(৫)

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥ ২০
পর প্রতি দয়া আর হিত-আচরণে।
শরীরের শোভা বৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥

(৬)

ঋণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগ-শেষ।
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ। ২৪
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয় ॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১৭ ॥

ব্যর্থ প্রয়াস

কোন্ মূঢ় চিত্রকরে   পদ্ম-দেহ চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে   মাখাইলে মৃগমদে,
অতি-সুখ লভে মধুলোভা ?
কসিত কাঞ্চন-কায়   কিবা কার্য্য সোহাগায়
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে,   দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ-রঙ্গ-ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি   প্রখর ভাস্কর-ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি   গজমুক্তাফলরাজি ?
মাজিলে কি হয় সমুজ্জল ?

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ পরিবর্ত্তন যুগ ॥

॥ ১৮ ॥

সীতার পঞ্চবটীবাস

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি ধারা, কহিলা জানকী,
মধুর-ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,— "হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি। পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে,
(কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে;) ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি; রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি: কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে

পিক-রাজ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন-চিত্ত বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে,
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে
সরসী আরসী মোর! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে;
সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবি বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে!
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে, কভু সাধ্বী ঋষি বংশ-বধূ
সুহাসিনি আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)

পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব লতিকার, সতি! দিতাম বিবাহ
তরু সহ, চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে,
নদী তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে

সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে ;
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবনমোহিনী !”

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

॥ ১৯ ॥

রামের বিলাপ

(শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের উদ্দেশে)

চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
“রাজ্য ত্যজি’ বনবাসে নির্বাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন, তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে

"কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়? না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিন, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ; বিষণ্ণ সুগ্রীব মিতা সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাত—'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর?' কি ব'লে বুঝাব

উর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে !
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে,
প্রাণাধিক ! হে লক্ষণ, এ আচার কভু
সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ! হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ হে প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

॥ ২০ ॥

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশী ! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্ ॥

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

॥ ২১ ॥

আত্মবিলাপ

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায় !
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ?—এ কি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার,
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার !

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে,
কি ফল লভিলি ?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

(৫)

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়।
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ॥
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

॥ ২২ ॥

আদিকবি

(১)

হিমাদ্রি-শিখরে 'পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতিঃ ওই পুণ্য-তপোবন !
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী-অরুণ ঊষা কুমারী-রতন।

(২)

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে ;
নিরখি লোচন-লোভা
পুলিন বিপিন-শোভা
ভ্রমেণ বাল্মীকি মুনি ভাব-ভোলা মনে।

(৩)

শাখি-শাখে রস-সুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দু'জনায় ;
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

(৪)

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি' দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে !

(৫)

কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবিচ্ছবি, ভুবন উজলে।

চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে !

(৬)

কিরণ-মণ্ডলে বসি'
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী—
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা-মেয়ে,
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে ।

(৭)

হাসি-হাসি শশি-মুখী,
কতই কতই সুখী ।
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে ।
কভু হেসে ঢল-ঢল,
কভু রোষে জ্বল-জ্বল,
বিলোচন ছল-ছল করে প্রতিক্ষণে ।

(৮)

করুণ ক্রন্দন-রোল
উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বল বালা চাহিলেন ফিরে ;
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে !

(৯)

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আর বার বাল্মীকিরে

নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ।
কাতরা করুণাভরে,
গা'ন সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী ।

(১০)

সে শোক-সঙ্গীত-কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায় !
নিরখি' নন্দিনী-ছবি
গদগদ আদি-কবি—
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায় !

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

॥ ২৩ ॥

সমুদ্র দর্শন

এ-কি, প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার !
অসীম আকাশ-প্রায় নীল জল-রাশি ;
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি !
আগু-পাছু কোটি কোটি কি কল্লোলমালা !
প্রকাণ্ড পর্ব্বত সব যেন ছুটে আসে ;
উঃ ! কি প্রচণ্ড রব ! কানে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে !
তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;

রাশি রাশি সাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায়।

আপনার মনে ওহে উদার সাগর,
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই !

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোড়িত মন ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদার আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বলন জ্বালা দপ্‌ দপ্‌,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার !

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো ;
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভাল !
দেবের দুর্ল্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জ্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন ;
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিভে তারা গিয়েছে কখন।
কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি—
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।

সত্যযুগে আদি-মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমনি ;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।
এই যে দাঁড়ায়ে পুনঃ সেই কিনারায়।
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জল-রাশি !
উদার সাগর, দাও বিদায় আমায় !
আজিকার মত আমি আসি তবে আসি।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

(২৪)

মাতৃমঙ্গল

(১)

স্মরিয়া মায়ের মায়া,
পুলকে না পুরে কায়া,
আঁখি না রসাক্ত হয়, হেন যেই জন !—
তার কাছে না থাকিব,
কবে মম কণ্ঠনালী করিবে ছেদন !
মুখে মাতৃ-নিন্দা ফুটে,
ঈশ-ভ্রু কুঞ্চিয়া উঠে,
করে বজ্র টলে,—করে অনল বমন ;
জননীর কটু ভাগে,
উল্লাসি নরক হাসে—
কট্-কট্ রবে করে কপাট-পাটন ;
শাণ দেয় শস্ত্রচয় যমচরগণ।

(২)

আর কি সে তনু আছে,
ছিল যা মায়ের কাছে !—
কোথা ফুল্ল সে কপোল, সে ফুল্ল নয়ন !
কোথা নৃত্য হর্ষভরে,
কোথা করতালি করে,
কোথা সে চপল কায়, সপুলক মন !
কোথা খল-খল হাস,
কোথা কল-কল ভাষ,
সে সুষুপ্তি-সুখময় নাহি পাই আর !
ভাবি-ভয় বিবর্জ্জিত
কোথা সে অদীন চিত,
নিকুঞ্জে না দেখি আর ঘর দেবতার !
দেখিতে না পাই হাসি মুখে প্রতিমার !

(৩)

হে মাতঃ ! হৃদয়ে ধর,
সন্তানের ত্রাস হর,
তোমা বিনা ভব-দুঃখে কোথা পরিত্রাণ !
তুমি পরশিলে করে,
জ্বর জ্বালা তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠসমান !
তুমি মুখে দিবে যাহা,
মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ !
তব কাছে স্বর্গবাস,
তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,

ধরায় না ধর্ম্ম তব সেবার সমান।
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্ !

(৪)

ধরা হীরা হয়, হায় !—
সিংহাসন রচি তায়,
বসাইতে পারি যদি জননী তোমায় !
ফুল হয় তারাদল
চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি যদি পূজি তব পায় ;
সুধাকর-সুধাগারে
পারি যদি আনিবারে,
সুনিত্য যদি সে সুধা করাই ভোজন !
পারিজাত-দল দিয়া
নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন ;—
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন !

(৫)

তুমি, মা ! না ধর দোষ,
তুমি, নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায় !
শত অপরাধ করে
তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়।
বাণী বর্ণিবারে চায়,
শেষ যদি সদা গায়
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান।

হে সুর, অসুর, নর,
যেবা তনু বুদ্ধি ধর,
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান—
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুক সমান!

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

॥ ২৫ ॥

পদ্মের মৃণাল

(১)

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল-হিল্লোলে;
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে;
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ, ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয়, ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন,—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি?
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা বলবীর্য্য স্রোতঃশিলা
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি।

(৩)

কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল ;
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বলবীর্য্য-পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি, মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণ স্তূপ অবনীতে অপরূপ !
দেখাইল মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিশরবাসী—কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ— অবনীতে অপরূপ !
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল,
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল ?

(৪)

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি—
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি,
অতুল অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নর-ধন্য কুলে দিতে বাতি ?
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি ?
ম্যারাথন, থার্ম্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীশ আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি—,
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি ?
যার পদচিহ্ন ধ'রে অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইতে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি ?

(৫)

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম ?

ধরণীর সীমা যার ছিল রাজ্য-অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তার ? রাজপথ দুর্গে যার
পৃথিবী বন্ধন ছিল কোথায় সে রোম ?
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম ?

(৬)

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য-কিরণজালে উহারাই কোনকালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
আরবের পারস্যের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানি-শেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ—
কাফের যবনবৃন্দে করিল দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন।
'দীন্' ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন,
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

(৭)

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি—
কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী ?
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্ম-মৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি ?

জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল
সে দেশ নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
বুদ্ধি বীর্য্য-বাহুবলে সুধন্য জগতীতলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি ?

(৮)

নিয়তির গতিরোধ হবে না আর ?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার—
মিশর পারস্য-ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি ?
ভারত থাকিবে কি রে চির-অন্ধকার ?
জাপান জিলঙে নিশি পোহাবে এবার ?
যত্ন আশা পরিশ্রমে, খণ্ডিয়া নিয়তিক্রমে
উঠিয়া প্রবল হ'তে পারে নাকি আর,—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?
না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা, এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার,
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২৬ ॥

জীবন সঙ্গীত

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার—
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।

মানব-জনম-সার এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন ;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন।

ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায়, ক্ষণ যায় সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর !

সংসার- সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব !
কর-যুদ্ধ বীর্য্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়।

সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২৭ ॥

কবির অন্ধদশা

বিভু ! কি দশা হবে আমার ?
একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন !
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী প'রে
চির দিন করিতে ক্রন্দন !
জীবনে বাসনা যত সকলই করিলে হত
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ;
না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার
চির-অস্তমিত দিনমণি !
ধরা, শূন্য, স্থল, জল অরণ্য, ভূমি, অচল
না থাকিবে কিছুরি বিচার,
না রবে নয়নে দৃষ্টি তমোময় সব সৃষ্টি,
দশদিক ঘোর অন্ধকার—
বিভু ! কি দশা হবে আমার ?
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ, হবে না কি, হে ভবেশ !
জানিব না, দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু ;
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জ্বলে,
শিশির বসন্তকালে, আসে যাবে চিরকাল,
আমি না দেখিব কোনো কালে।
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নর জগতের সুখকর,
তাও আর হবে না দর্শন,

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে
দেবতুল্য মানব-বদন।
নিজ কন্যা-পুত্র মুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না,
অপূর্ব্ব ভাবের চিত্র, থাকিতে স্মরণমাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা!
কি নিয়ে থাকিব তবে, সিদ্ধ কি সাধনা হবে?
ভবলীলা ঘুচেছে আমার;
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু! কি দশা হবে আমার!

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ২৮ ॥

সুখী ও দুঃখী

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে না হবে—না হবে তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

॥ ২৯ ॥

পলাশীর যুদ্ধ

(১)

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

(২)

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি করি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন !

(৩)

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।

(৪)

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল—
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ-অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

(৫)

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মির-মদন পতন !

(৬)

"হুর্‌রে ! হুর্‌রে !"—করি গর্জ্জিল ইংরাজ !
নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ ।

(৭)

"দাঁড়া রে । দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া এইক্ষণ
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন ।

(৮)

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন ।

(৯)

"সেনাপতি ! ছি ছি, এ কি ! হা ধিক্ তোমারে !
কেমনে, বল না, হায় !
কাষ্ঠের পুতুলপ্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে ?

(১০)

"ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?

(১২)

"বীরপ্রসবিনী যত মোগল-রমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে
প্রসবিল কুলাঙ্গারে !
চঞ্চলা মোগল-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি

(১৩)

"কেমনে যাবি রে ফিরে ক্ষত্রিয়-সমাজে ?
কেমনে দেখাবি মুখ ?
জীবনে কি আছে সুখ ?
স্ত্রী-পুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে !

(১৪)

"সহে না বিলম্ব আর, চল ভ্রাতাগণ
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে।
দেখাব ক্ষত্রিয়-বীর্য্য, দেখাব কেমন !"

(১৫)

বাধিল তুমুল যুদ্ধ ; অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম-অগ্নি-উদ্‌গিরণ,
জলধর মধ্যে যেন অশনি সম্পাত।

(১৬)

নাচিছে অদৃষ্ট-দেবী, নির্দ্দয় হৃদয়,
এই বৃটিশের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এইবার ইংরেজের হ'ল পরাজয়।

(১৭)

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,—
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ !
কর অস্ত্র সম্বরণ !
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

(১৮)

উত্থিত কৃপাণ কর হইল অচল ;
সম্মুখে চরণদ্বয়
উত্থিত—তুরঙ্গচয়
দাঁড়াল, নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

(১৯)

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ
নদী কোনমতে তারে
যদি বা টলাতে পারে,
উপাড়িয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

(২০)

তেমতি বারেক যদি টলে সৈন্যগণ,
ইংরাজ-'সঙ্গিন'-করে,
(ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে)
ছুটিল পশ্চাতে—যেন কৃতান্ত শমন।

(২১)

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল, সঙ্গিন-ঘায়—
বরিষার ফোঁটা প্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে নিমেষে ধরায়।

(২২)

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিশ বাজনা
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয় ঘোষণা।

—নবীনচন্দ্র সেন (ঈষৎ পরিবর্তিত)

॥ ৩০ ॥

যমুনা লহরী

(১)

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও !
কত কত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও !
পড়ি' জল-নীলে ধবল সৌধ-ছবি
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও ।

(২)

যুগযুগবাহী প্রবাহ তোমারি
দেখিল কত শত ঘটনা ও !
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল, লয় পাইল ও ।

(৩)

কলকল-ভাষে বহিয়ে, কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও ?
স্মরণে আসি' মরম পরশে কথা—
ভূত সে ভারত-গাথা ও ।

(৪)

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা---
গরজিল কোনদিন সমরে ও !
আজি শব-নীরব রে যমুনে, সব
গত যত বৈভব কালে ও ।

(৫)

শ্যাম সলিল তব লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও ;
কাঁপিল দেশ তুরগ-গজ-ভারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও ।

(৬)

তব জল-তীরে পৌরব যাদব
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও ;
শাসিল দেশ অরিকুল নাশি'
ভারত স্বাধীন যেদিন ও ।

(৭)

দেখিলে কি তুমি বৌদ্ধ-পতাকা
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও—
তিব্বত চীনে ব্রহ্ম তাতারে
ভারত স্বাধীন যেদিন ও ।

(৮)

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়
ভাতিল কত শত রাজা ও !
আসিল স্থাপিল শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও !

(৯)

কত শত দুর্জ্জয় দুর্গম দুর্গে
বেড়িল তব তটদেশে ও ;
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে
চিরযুগ সম্ভোগ-আশে ও ।

(১০)

সে সব কৌতুক কাল-কবল আজি
লেশ না রাখিল শেষ ও।
কোথা সেই গৌরব নিকুঞ্জ-সৌরভ ?
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও !

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

॥ ৩১ ॥

বঙ্কিম-বিদায়

(১)

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের শত সন,
এক পায় দুই পায় বসন্ত চলিয়া যায়,
শ্যাম মমতায় মেখে বন-উপবন !
তার সে বিদায়-ভোজ—মধু খায় রোজ রোজ,
ফুলের গেলাস ভরি' মধুকরগণ।
তরুণ তমাল গাছে কি জানি কি লেখা আছে—
কোকিল করিছে পাঠ সে অভিনন্দন।
উড়ায়ে রুমাল ছাতা—নূতন পল্লব পাতা,
আনন্দ জানায় যেন নীরবে কানন।
বসন্ত বিদায় আজ, সভাপতি দ্বিজরাজ
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ,
সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—তের-শত সন !

(২)

সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র—হায় হায় হায়,
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায়
লইয়ে নবীন, হেম অক্ষয়ে অক্ষয় প্রেম,
চন্দ্রনাথ, প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু, রায়,

ধ'রে সবে হাতে হাতে, লইয়ে আসিলে সাথে,—
পারিজাত-বন থেকে শ্যামা পাপিয়ায় !
ছিন্ন-আশা ছিন্ন-বাসা সাজাইলে বঙ্গভাষা,
শীতের শিশির মুছে মলয়-হাওয়ায় !
এখনো পুরেনি তার সময়ের অধিকার ;—
সায়াহ্ন — ছাব্বিশে চৈত্র, হায় হায় হায় !
বঙ্কিম বসন্ত-কবি আগে তার যায় !

(৩)

যাবে তুমি ?   এ জগতে কে না বল যায় ?
কেহ গেলে হাসে লোকে, কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
পরাণ বিদরে কারে করিতে বিদায় !
বসন্ত বাঁচিয়া থাক্, নিদাঘ শিশির যাক্,
কুলার বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায় !
বার মাস নিতি নিতি, থাকুক পূর্ণিমা তিথি,
চ'লে যাক অমা-রাহু—ক্ষতি নাহি তায় ।
তুমি থাক, মোরা যাই, আমরা যে ভস্ম ছাই,
কি হবে এ কোটি কোটি রেণু-কণিকায় ?
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব মান—
তুমি কবি-কোহিনূর কিরীট-চূড়ায় !
মোরা যাই, তুমি থাক, সুখী কর মায় !

(৪)

গভীর বসন্ত-নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন !
পাতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ   আঁধারে দেখিনি কেউ,
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ !

পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন !
কত যুগ-যুগান্তর হৃত-রত্ন রত্নাকর—
দেবতা লুটিয়া নেছে করিয়া মন্থন,
পরশে কবির ছাই, ফিরিয়ে পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন !
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি-পরশে হবে মুকুতা-সৃজন।
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সনে,
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ !
পাষাণে পড়িলে দাগ, হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা, কৌস্তুভ-রতন !
সত্যই কি কবি মরে ? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

॥ ৩২ ॥

কামনা

ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার :
আমার আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যে-টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

-কামিনী রায়

॥ ৩৩ ॥

পাছে লোকে কিছু বলে

করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা থাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
হৃদয়ে বুদ্‌বুদ্‌ মত
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি,
নিরমল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা—
চ'লে যাই উপেক্ষার ছলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
একসাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !
বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে !

—কামিনী রায়

(৩৪)

চাহিবে না ফিরে

পথে দেখো ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে',
উপহাস করি' কেহ যায় পায় ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি বরষি' গঞ্জনারাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়ে যায় শেষে ফেলে'।

পতিত মানব-তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ?
পথে প'ড়ে অসহায়,— পদে তারে দলে' যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবাড় ?

সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার :
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও-শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চ'লে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া ক'রে, তুলিবে না হাত ধ'রে
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি' থামিবে না, ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয় নিয়া,
তোমাদেরি হাতে ধ'রি হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্ক-মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি দাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।

—কামিনী রায়

॥ আধুনিক যুগ ॥

॥ ৩৫ ॥

বৈশাখ

(১)

কপালে কঙ্কণ হানি', মুক্ত করি চুল
"বাসন্তী যামিনী" আহা কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার "চৈত্রমাস', অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি', জানু করি নত,
কার তপ ভাঙ্গিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মূরতি ও যে!—একি সর্ব্বনাশ!

(২)

ললাটে অনল, হের, ধক্ ধক্ জ্বলে!
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম, মাখি' কুতূহলে,
তপে মগ্ন—চিনিলে না বৈশাখ-দেবেরে?
হে চৈত্র, এ নিশি-শেষে, নিয়তির ফেরে,
হারাইলে প্রাণ! আহা!—নাশিতে জীবন,
রোষান্ধ বৈশাখ ওই মেলিল নয়ন!

(৩)

দিগঙ্গনা হাঁকি ডাকে, "কি কর, কি কর!"—
নব ঊষা বলে—"ক্রোধ সম্বর, সম্বর!"
কোকিল ডাকিল কুহু, করিয়া মিনতি,
সম্ভ্রমে অশোক-পুষ্প করিল প্রণতি!
বৃথা! বৃথা! বৈশাখের দু'চক্ষু হইতে,
নিঃসরিল অগ্নিকণা, বেগে আচম্বিতে!

(৪)

ভস্ম হ'ল "চৈত্রমাস" ! হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু "বাসন্তী যামিনী" !
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল ঝরিয়া,
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পলাইয়া !
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,—
ভিজিল শিরীষ-পুষ্প নয়নের নীরে।

(৫)

আম্রের বাছনিদের সুহরিত দেহ
ভরি' গেল রক্তপীতে, খসি' গেল কেল।
কঠিন উপলে বসি' সারস-সারসী
বিহগ ভাষায় ডাকে—"কোথায় সারসী !"
গহন অরণ্যে ছায়া পলায় তরাসে,—
ক্লান্ত পান্থ শ্রান্ত হয়ে আতপে সন্তাষে।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

॥ ৩৬ ॥

অশোক তরু*

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা-চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ?
কোন্ দোল-পূর্ণিমায় নব বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন্ চির সধবার ব্রত-উদ্‌যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ী সিন্দুর-বরণ ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?

বৃথা চেষ্টা !—হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব-প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধাঁ আলোক আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা',
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

॥ ৩৭ ॥

প্রার্থনা*

দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাইক বিধাতা ;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে'।
সুখী বলে, -'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে'।
জ্ঞানী বলে,—'কার্য্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষা কাতর'।
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর'।
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান'।
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়' !
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয় !'

—অক্ষয়কুমার বড়াল

৩৮ ॥

মানব-বন্দনা

(১)

সেই আদি যুগে যবে অসহায় নর,
নেত্র মেলি ভবে.
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি',
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত-ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

(২)

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিলে—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল,
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল !

দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

(৩)

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির,
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলাল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
—অতিথি সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র স্বরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার।

(৪)

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি',
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি',
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?

কে শিখাল শিলাস্তূপে অশ্বথের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে
দেব-দেবী-নাম ?

(৫)

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'—
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটিরচ্ছায়ে কার কণ্ঠসাথে
নিবিদ্ উচ্চারি'—
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী !
কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন—
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞভাগে ?

(৬)

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?

পঞ্চভূত, বশীভূত প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুক্তিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

(৭)

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুত-মোহন,
বজ্র মুষ্টিধর !
চরণে ঝটিকা-গতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা !
উদ্দীপ্ত তেজস নেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল-কোলে অণু-পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

(৮)

নমি তোমা', নরদেব ! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি !
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত, রশ্মি শিরে চূর্ণ-মেঘ,
পদে শষ্পভূমি !
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে ;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে !

হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় :
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম-ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

(৯)

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু বিশ্বমূলে অণু
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী স্থপতি-তক্ষণ
কর্ম্ম-চর্ম্মকার !
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
কহ, অদ্রিভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে—
আত্মার আত্মীয় !

—অক্ষয়কুমার বড়াল

॥ ৩৯ ॥

সন্ধ্যা

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুলতনুখানি ।
তরল গুণ্ঠন-আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে ;
সরমে উছলি' পড়ে কত প্রেম-বাণী !

নব নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত ;
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ !
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন !

নয়নে গভীর তৃপ্তি—
ক্ষীরোদ-সমুদ্র-দীপ্তি ;
অধরে চন্দ্রিকা-হাসি—বিজয়-বিশ্রাম ;
নিশ্বাসে মলয়াবেগ,
অলকে অলক-মেঘ,
শুক্রতারা-মুকুতার—নৃত্য অভিরাম !

আসে ধনী আথিবিধি,
কপালে তারকা-সিঁথি,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনান্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে ;
দিগন্ত-বসনাঞ্চলে কত না রতন !

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য !
সম্ভ্রমে প্রণমে বিশ্ব,
দেবতা আশীষচ্ছলে বরষে শিশির ।
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি,
অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর ।

ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী-তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে' হেরিছে ধরণী !
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যাসতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

॥ ৪০ ॥

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে !
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর,
আউসের ক্ষেত জলে ভর-ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনায়েছে, দেখ্‌ চাহি' রে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ॥
ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে !
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে, ওগো দেখ্‌ দেখি—
মাঠে গেছে যারা তা'রা ফিরিছে কি,

রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজ খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে।

শোন শোন ওই পারে যাব ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে!

পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু'কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি' জল
ছলছল উঠে বাজি' রে,
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজি রে॥

ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে গো, তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে,
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহিরে!

ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহি রে!
ওগো, আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪১ ॥

খাঁচার পাখী

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌দিগন্ত ঢাকি';
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে, ওগো,
আমরা খাঁচার পাখী,—
হৃদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল কি ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে,
কোথা কিছু নাই বাকি ?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখী।
ফাল্গুন এলে সহসা দেখিন পবন হ'তে
মাঝে মাঝে রহি' রহি'
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হ'তে
অপূর্ব্ব আশা বহি'।
হৃদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কি মায়ামন্ত্রে বন্ধন-দুঃখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া—
ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি';
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখী।

আজি দেখ ওই পূর্ব্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই যায় না দেখা,—
আজি কোনদিকে তিমির-প্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহিরে,
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে?
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি—
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি—
আমরা খাঁচার পাখী।
ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদ না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা!
হৃদয়-বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর;
সকল মেঘের ঊর্দ্ধে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবেনি, নেবেনি প্রভাতের রবি"—
কহ আমাদের ডাকি',
মুদিয়া নয়ান সেই গান
আমরা খাঁচার পাখী।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪২ ॥

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণ-তট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি' জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার।
বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত-কায়
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।
মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে!
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।
দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে,
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন;
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।
রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা;
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার,
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।"
বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি' করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুই পাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে',
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচী-মুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।
ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিল রাখি'
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি!
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে!
"আহা আহা" চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়,
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।
বারেকের তরে গুরু না তুলিল মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।
দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু;
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে।
"এখনো উঠাতে পারি", করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪৩ ॥

পূজারিণী*

(অবদানশতক)

নৃপতি বিম্বিসার।
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে,
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পাদমূলে সোনার থালায়,
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক-প্রদীপমালা।
অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে
পিতার আসনে আসি,'
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
স্থাপিল যজ্ঞ অনল-আলোতে
বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।
কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—

এই ক'টি কথা জেনো মনে সার,—
ভুলিলে বিপদ হবে।"
সেদিন শারদ দিবা-অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি।
শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা,—
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা,
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে ?"
সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সিঁথির সীমার 'পরে।
শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি' গেল রেখা,
কাঁপি' গেল তার হাত,—
কহিল—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চলে',
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে
বিষম বিপদপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি কিঙ্কিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে !
শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে,
ছুটিয়া চলিতে আছে ?"
দ্বার হতে দ্বারে ফিরিয়া শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি,
"হে পুর-বাসিনি !" সবে ডাকি কয়,
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময় !"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।
দিবসের শেষ আলোক মিলা'ল
নগর-সৌধ 'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতি-ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে।
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে।

সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।
—এমন সময় হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপাদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত!
মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
সুধাল, "কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল,—"শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী!"
(সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপাদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ-আরতির শিখা।)

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪৪ ॥

মাতৃহারা

(১)

সাঙ্গ হ'লে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
সন্ধ্যাটি না হ'তে হ'তেই, গাঢ়-ঘুমের ঘোরে,
ঘুমোচ্ছিস্ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ও-রে !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই ঘুমিয়ে গেছিস্,
নেতিয়ে গেছিস্,
বাছা আমার আতুরে !
—ওরে আমার যাদু রে !

(২)

কে দিল তোল মাথায় বালিশ ? কে দিল তোর
চাদর গায় ?
কে পাড়াল ঘুম ?
ওরে আমার ভাঙ্গা-ঘরে চাঁদের আলো ! ওরে আমার
বৃন্তচ্যুত লুণ্ঠিত মন্দার-কুসুম !
শুন্‌তো হুকুম, কর্ত্ত পেয়ার,
যে জন, এখন নাই ত সে আর ;
মায়া কাটিয়ে চলে' সে ত গেছে এখান থেকে ;
তোকে যাদু, আমার কাছে রেখে !

(৩)

যত দিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল,
তুই বলে' সে সারা ;
এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে,
—ওরে মাতৃহারা !

কোথায় সে চলে' গেল,
কিছুই না বলে' গেল ;
এইটে কেবল বুঝিয়ে গেল সার—
যে, ফির্বে না সে আর।

(৪)

সে যদি তোর থাক্‌তো, খানিক আবদার কর্ত্তিস্
শোবার আগে,
দাবি কর্ত্তিস্ চুমা ;
টেনে নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদুস্বরে
"ঘুমা, যাদু ঘুমা"।
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদরখানি,—গায়ে দিয়ে,
বালিশ দিয়ে মাথায়—
ঘুমটি অমনি ছেয়ে এল আঁখির দুই পাতায় !
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি
ছেঁড়া একটা মাদুরে,
ওরে আমার যাদু রে !

(৫)

বুঝিস্ না তুই নিজের দুঃখ, ওরে সুখী বালক—
তাই ত আছিস্ সুখে ;
বিজ্ঞ আমি, বুঝি সূক্ষ্ম,
বুঝি বেশী, তাই এ দুঃখ
বেশী বাজে বুকে।
তুইও বুঝবি বড় হ'লে, মনে পড়বে যখন
ছেলেবেলার কথা—
মায়ের যত্ন, মায়ের সেবা, সর্ব্বদা, সর্ব্বথা।

নিজের মায়ে আদর করে' ডাকবে যখন কেহ,
তখন রে তোর মনে পড়বে, বিশ্বজগৎ হ'তে
লুপ্ত মাতৃস্নেহ !

(৬)

এখন ওরে মূঢ় শিশু, এখন কি তোর কাছে,
মায়ের মূল্য আছে ?
এখন রে তোর কাছে মা কি মাসী পিসী মামী,
একটুখানি আদর দিলেই একই রকম দামী।
এখন, যখন জঠর জ্বলে, পেলেই হোল খাদ্য কিছু,
কাছে একজন শুলেই হোল রাতে ;
যে সে হোক না, বল্লেই হোল ভূতের কিংবা বাঘের গল্প,
খেলার সাথী পেলেই হোল সাথে ,
এখন কি তুই বুঝবি, ওরে মূঢ় !
সে সব যত প্রাণের কথা গূঢ় ?

(৭)

—হায়, যাদু, সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝতেও না-পারা,
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃহারা।
তাইরে তোরে দেখে এমন ভূমিতলে একা অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় !
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা,
—ওরে মাতৃহারা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

॥ ৪৫ ॥

তা, সে হ'বে কেন !

(১)

তোমরা—দেশোদ্ধার কর্ত্তে চাও কি ক'রে মুখে বড়াই ?
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্ত্তে চাও কি লড়াই ?
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—ইংরাজ গৌরবে ক্ষুব্ধ বলে' চাও কি যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে ?
—তা' সে হ'বে কেন !

(২)

তোমরা—হিন্দু ধর্ম্ম "প্রচার" কোরেই, হ'তে চাও যে ধন্য,
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—মূর্খ হ'য়ে হ'তে চাও যে বিশ্বে অগ্রগণ্য !
তোমরা—বোঝাতে চাও হিন্দুধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম মর্ম্ম—
"ভীরুতাটি আধ্যাত্মিক আর কুঁড়েমিটা ধর্ম্ম !"
অম্‌নি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেতচর্ম্ম ?
—তা' সে হ'বে কেন !

(৩)

তোমরা—সাবেকভাবে সমাজটিকে রাখ্‌তে চাও যে খাড়া ;
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—স্রোতটাকে ফিরাতে চাও যে দিয়ে মুখের তাড়া ;
—তা' সে হ'বে কেন !

তোমরা—বিপ্র হ'য়ে ভৃত্য-কার্য্য করে' বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি ক'রে শুধু রাখ্‌বে সমাজটিরে ?
—তা' সে হ'বে কেন !

(৪)

তোমরা—চিরকালটা নারীগণে রাখ্‌বে পাঁচিল ঘিরে',
—তা' সে হ'বে কেন !
তোমরা—গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখ্‌বে রমণীরে ?
—তা' সে হ'বে কেন ?
তোমরা—চাও যে তা'রা বদ্ধ থাকুক, এখন যেমন আছে ;
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যা'বে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা' সে হ'বে কেন ।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

॥ ৪৬ ॥

চাতক

সরিছে আঁধার কালো ;
ঊষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ-আধ ছবি ;
এত ভোরে, কোন্ পাখী !
গাহিছ আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ?

মধুর কাকলী মুখে,
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায় !
সুনীল গগনকোলে,
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে,
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায় !
কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছে চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও !
দেবতার শিশুগুলি
খেলে হেথা হেলি দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?
চিনেছি চিনেছি আমি
ওই যে চাতক তুমি,
প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব-ভাগে,
সুললিত গানে ভরি মাতায়ে ভূতল !
শুনি ও অমৃত-গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃতধারা ঢালিছে ধরায়,
ছুটিছে অমৃতরাশি,
অমৃত-হিল্লোলে ভাসি',
অমৃত-তুফানে যেন মন ভেসে যায় !

হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?
কহ রে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ;
আমি ত বুঝেছি এই,
জগত-জননী যেই,
তাহারি শিখানো গীত, আর কারো নয় !
যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী-ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;
যাঁহার কৌশলবলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেই রে শিখায় !
অমন মধুরে পাখী !
তাঁরেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ-দুয়ারে উঠি' পরাণ খুলিয়া ?
তুমি রে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া !

— মানকুমারী বসু

॥ ৯৭ ॥

বাসনা*

ছুট্‌ব আমি সরল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে !

বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে-স্রোতে ;

এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল আকাশের তলে।
বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব না'য়ে,
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্‌চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে,
উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির 'সাত-নরী',
কদম-কেশর শিউরে উঠে'
পড়্‌বে ঝরি' ঝরি'।

মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টি-ধারার 'চিকে'-ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার 'পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়িয়ে বাঁধ্‌ব 'মোয়া',
লাঙ্গল দেব ভূঁয়ে,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে 'দেয়া',
আসবে আমন রুয়ে' !
আকাশ-ভাঙা মুষল-ধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড় !
পাকুড় তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে' নুয়ে'।

অবাক্ হয়ে দাওয়ায় বসে'
দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়,
পাখীর সাঁতার-খেলা ;
কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়িয়ে গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌রে গভীর—
পাখায় রঙের মেলা।

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি' ;
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে
টান্‌ব যাঁতার দড়ি ;

ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া
কাঁপিয়ে 'নেয়াই' পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যূঁই—
আলোর ছড়াছড়ি।

শুন্‌তে যাব ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজবে ব্যথা,
ফিরব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর-আগ-বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে'
সাঁঝের আঁধিয়ারে ;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু'টি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি'
'ফনী-মনসা'র বেড়ায়-ঘেরা'
দুর্গা-দীঘির ধারে।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ করিব রাতে।

না ফুটিতেই উষার আঁখি
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ'
'প্রাণের 'একতারা'তে।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৫৮ ॥

ওয়াল্টেয়ারে

সাম্‌নে হেরি সুনীল বারি
তালীবনের ফাঁকে,
গেরুয়া-রঙ্‌ ভাঙা-মাটি
ঢালু পথের বাঁকে।
ঝর্ণা-ঝালর পড়ছে ঝরি'
শ্যামল তরু-পর্ণ 'পরি,
আলোক-লতা অলক-জালে
কালো পাথর ঢাকে।

নীল-লহরীর মাথায় অথির
ফেনার যুথীরাশি
দেয় গো চুমা লাল বালিতে—
দেখ্‌রে হেথায় আসি';
বুলিয়ে তুলি গিরির গায়ে
ঘোর বেগুনী-রঙ্‌ ফলায়ে
সাগর-ধোয়া রবির করে
ঝরছে তরল হাসি!

পুরাণো কোন গানের কলি
ঢেউয়ের কলস্বরে
জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়ে
ধূসর শিলার 'পরে—
দূর-প্রসারী লবণ-বারি,
ভাস্‌ছে সাগর-মরাল-সারি,
গাহন করে পাষাণ-করী—
শীকর-ঝারি ঝরে।

কবে গো রাম রঘুমণি
হারিয়ে জানকীরে
আলাভোলা এলেন হেথায়
রত্নাকরের তীরে ?
যে দিকে হায় ফিরান নয়ন,
ভূধর, সলিল, আকাশ, কানন—
বিরস মলিন সব সুষমা,
অমা-তিমির ঘিরে !

এখনো এই মধুর ভূমে
সুদূর বিধুরতা
গোপন আছে সাগর-স্বরে,
করুণ সে বারতা।
উলঙ্গ ওই তামিল-বালক
কুড়ায় রঙীন পাখীর পালক,
চাপিনু তায় বুকের মাঝে—
কইনু নীরব কথা।

এ জন্মে আর হয় তো কভু
হবে না মোর আসা,
থুয়ে গেলাম পাথর ফুঁড়ে
আমার ভালবাসা—
তরু-বাকল পরগাছায়
বাসনা মোর ঘুরবে হেথায়,
উষার সরম-অরুণিমায়
মিট্‌বে প্রাণের আশা।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৪৯ ॥

চাষার ঘরে

প্রভাত হইতে ভদ্র-পাড়ায় ঘুরে' ঘুরে' সারাবেলা,
হজম করিয়া হরেক-রকম ভদ্র-আনার ঠেলা—
মুখোস-পরানো মোলাম মিথ্যা, বিনীত অহঙ্কার,
গরিবের পরে সহৃদয় ঘৃণা, ভণ্ডামি করুণার,—
সন্ধ্যাবেলায় শূন্য জঠরে এলাম রে তোর দ্বারে,
ওরে চাষা, তোর আগড়টা খোল্, ঠাঁই দে দাওয়ার ধারে!
তোরি ঘরে আজ রাতটা কাটাব, ক'য়ে দুটো সোজা কথা;
ঠিক জানি, তুই চিরদুখী-বুকে বুঝিবি আমার ব্যথা;
না যদি বুঝিস্ তাও তো বুঝিব, রহিবে না কোন গোল,
নহে সে মিথ্যা মাথা-নাড়া শুধু—ভদ্র-আনার ভোল!
থাক্ থাক্ ভাই, ব্যস্ত হোস্‌নে, কাঁথাতেই হবে বেশ,
খড়ের বুঁদীটা ওই তো রয়েছে, ঘুম পেলে দেব ঠেস্।
এই শীতে আর পা-ধোবার জলে কোন দরকার নাই;
থাক্ রে পাগ্‌লা, হয়েছে প্রণাম, বোস্ দেখি কাছে, ভাই!

খাবার যোগাড়—এখন কি তার? হোক্ না খানিক রাত,
হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, তোর ঘরে খেলে যাবে নাকো আর জাত!
—দাঁড়িয়ে কেরে ও? তোরি ছেলে নাকি?
মদ্‌না না ওর নাম?

তোরি মত দেখি যোয়ান হয়েছে। করে তো রে কাজ-কাম?
ক্ষেতের কর্ম্মে ভারি দড় নাকি! আহা! ভারী খুসা শুনে'—
কি বল্লি?—এই কুড়িতে পড়িবে সামনের ফাল্গুনে!
সারাদিন ভাই, কিছু খাই নাই—সত্যি কথাই বলি,
বড়োলোক যারা—খেতে বলে কেউ? মিছে এত বড় হ'লি!
চা ও খানদুই বিস্‌কুট নামে সঙ্গে তাহারি চাট্‌—
তাই দিয়ে বটে রাখে কেউ-কেউ ভদ্র-আনার ঠাট্‌।
বাজে কথা যাক্;—ক' বিঘা চোতেলি করেছিস্ এই সন?
পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান ঘরে এল ক' কাহন?
মহাজন-দেনা, রাজার খাজনা—হয়েছে তো সব শোধ!
বেশ বেশ ভাই, বড় খুসী তোর দেখে' বিবেচনা-বোধ।
ওরে ও মদ্‌না একটা কল্‌কে তামাক পারিস দিতে?
—দিয়েছিস্ নাকি! এ যে দেখি তুই বাপেরেও
গেলি জিতে'!

ছাখ্, মানুষের কষ্ট থাকে না, হয় যদি লোক খাঁটি,
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি।
মাটির-ই যদি না এ হেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই,
বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন্-দুনিয়াটা,
মানুষ-ই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা;
তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যে জন, অন্ন তো তার মুখে—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে!

তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি,
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি ?
পায়ের তলায় ধূলা, সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি' তার শিরোপরে।
মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন, সহিবে সে অপমান ?
আত্মার সেই মহাদুর্গতি নহে দেবতার দান !
নাই ভগবান, নাইক ধর্ম্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে ?—
দূর করি' সেই ঝুটো সভ্যতা যত ফুঁকো শিক্ষার,
দূর করি' সেই ভেক্-নেওয়া যত অপমান ভিক্ষার,
আপনার মত আপন শিক্ষা নিজে নিতে হবে জিনে',
মুক্তির পথ মিলিবে তবে তো দেশজোড়া দুর্দ্দিনে !
ডাকিছে শেয়াল, রাত্রি দুপুর হ'ল বুঝি এইবার ;
খাটুনির দেহ এইবার ভাই বিশ্রাম দরকার !
সৌরভ যেন পাই বা কিসের—চিঁড়ে-কোটো বুঝি হয় !
ঢেঁকির শব্দ—তাই ত রে ঠিক। সমস্ত বাড়ীময়
নূতন ধানের মধুর গন্ধ মাতায়ে তুলিছে মন—
আর কি চাইরে ? কোন আয়োজনে নাই কিছু প্রয়োজন।
অতখানি দুধ ?—কি হবেরে ভাই ? খানিকটা রাখ্ তুলে',
হজম-ই হয় না খাঁটি দুধ, সে যে বহুদিন গেছি ভুলে'।
এখো-গুড় নাকি ! বাড়িতে হয়েছে ? তিন মণ দশ সের !
সবি ত বাড়ীর ! হায়, একি দান গরীব গৃহস্থের !

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

॥ ৫০ ॥

সরোবরে সন্ধ্যা

শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী ;
শ্যামল-সরসী-শিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে,
ঝিল্লির মঞ্জীর-মালা ঝিমি-ঝিমি-ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে !
জনশূন্য দুটি তীর—ধীবর-সন্তান গেছে ঘরে ফিরে,
ডোঙাগুলি কুলে-বাঁধা শিহরিয়া কাঁপে সন্ধ্যার সমীরে ;
গোধন গুছায়ে লয়ে নিভ-নিভ হ'তে গোধুলি-আলোক
ফেলিয়া কলার ভেলা, ঘরে ফিরে' গেছে রাখাল বালক !
নিভৃত কুলায়ে দিল মরালের দল শেষ পাখাঝাড়া,
নিঃসঙ্গ মরাল শিশু চিৎকারিছে দূরে হ'য়ে দলছাড়া ;
ধূসর আকাশপটে তরঙ্গিয়া দিয়া ভ্রূবঙ্কিম রেখা—
অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী ঊর্দ্ধে দিল দেখা।
সিক্ত শৈবালের গন্ধে পূর্ণ হ'য়ে উঠে সন্ধ্যার বাতাস ;
হিমশিক্ত শস্যক্ষেত্র তারি সাথে ফেলে দিনান্ত-নিশ্বাস।
জলে স্থলে নভস্তলে মোহিনী সন্ধ্যার নির্ব্বাক মন্তরে—
অশরীরী কল্পযন্ত্র শান্তিরসধারা ঝর-ঝর-ঝরে।

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

॥ ৫১ ॥

ছিন্ন মুকুল

সব-চেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে,

বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব-আগে।

সব-চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী,
খুসী ছিল ঘেঁসাঘেঁসির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে,
দিয়ে গেছে, জায়গা খালি ক'রে!

ছেড়ে গেছে পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি
ভয়-তরাসে ছিল যে সব-চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি!

চ'লে গেছে একলা চুপে চুপে—
দিনের আলো গেছে আঁধার ক'রে;
যাবার বেলা টের পেলে না কেহ,
পারলে না কেউ রাখতে তারে ধ'রে।

চ'লে গেল,—পড়তে চোখের পাতা,—
বিসর্জ্জনের বাজনা শুনে বুঝি!
হারিয়ে গেল,—অজানাদের ভীড়ে,
হারিয়ে গেল,—পেলাম না আর খুঁজি।

হারিয়ে গেছে,—হারিয়ে গেছে, ওরে!
হারিয়ে গেছে বোল্-বলা সেই বাঁশী,
হারিয়ে গেছে কচি সে মুখখানি,
দুধে-ধোওয়া কচি-দাঁতের হাসি।

আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি ;
ঢুকেছে হায় শ্মশান-ঘরের মাঝে,
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয় শ্মশানবাসী !
সব-চেয়ে ছোটো কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে।
সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৫২ ॥

চার্ব্বাক ও মঞ্জুভাষা

বনপথে চলেছে চার্ব্বাক,
সূর্য্যতাপে স্পন্দিত সে বন ;
ক্লান্ত আঁখি, নির্ব্বাক,
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
হ্রদের দক্ষিণ কূলে ভিড়ি'
শ্যাম-লেখা শোভিছে শৈবাল,
মরালীর পক্ষে চঞ্চু রাখি'
আঁখি মুদে চলেছে মরাল।

তীরে তীরে ঘন সারি দিয়ে
দেবদারু গড়েছে প্রাচীর,
বনস্থলী-মধুচক্র ভরি'
রশ্মি-মধু ঝরিছে মদির।

চলিয়াছে চার্ব্বাক কিশোর,
ভ্রূকুঞ্চিত, দৃঢ় ওষ্ঠাধর,
শিশিরের পদ্মকলিসম
রুদ্ধ প্রাণে দ্বন্দ্ব নিরন্তর।

"কে বলে বিধাতা আছে, হায়,
কে বলে সে জগতের পিতা,
পিতা কবে সন্তানে কাঁদায়,—
ক্ষুধায় কাঁদিলে দেয় তিতা!

"পিতা যদি সর্ব্বশক্তিমান
পুত্র কেন তাপের অধীন?
পিতা যদি দয়ার নিধান
পুত্র কেন কাঁদে চিরদিন?

"বালকের অ-খল হৃদয়ে
আমিও ক'রেছি আরাধনা,
ধ্রুব কি প্রহ্লাদ বুঝি কভু
জানে নাই ভকতি তেমন!

"ফল তার?—পদে পদে বাধা
আজনম,—বুঝি আমরণ!
মরণের পরে কিবা আর?
নাহি—নাহি—নাহি কোন জন।"

অকস্মাৎ চাহিল চার্ব্বাক—
পশ্চিমে পড়েছে হেলে রবি,
রশ্মি-রসে ডুবু-ডুবু বন,
আবির্ভূতা বনে বনদেবী !

মঞ্জুভাষা, রূপে বনদেবী,
শিরে ধরি' পাষাণ-কলস,
আসে ধীরে আশ্রম-বাহিরে,
গতি ধীর-মন্থর, অলস।

পর্ণরাশি-মর্ম্মর-মঞ্জীর
পদতলে মরিছে গুঞ্জরি',
অযতনে কুন্তলে বল্কলে
লগ্ন তার নীবার-মঞ্জরী।

লতিকার তন্তু সে অলক,
মঙ্গল প্রদীপ আঁখি তার,
পরিপূর সংযত পুলকে
কপোল সে পুষ্প মহুয়ার।

ওষ্ঠে তার জাগ্রত কৌতুক,
অধরেতে সুপ্ত অভিমান ;
বাহুলতা চন্দনের শাখা,
বর্ণ তার চন্দ্রিকা সমান।

চাহিয়া সহসা বালা ডাকিল চার্ব্বাকে—
"ওগো ! শোনো ! শোনো !
শুনিনু এনেছ তুমি মৃগ-শিশু এক,
আছে কি এখনো ?"

মন-ভুলে চেয়েছিল মুখপানে তার
বিস্ময়ে চার্ব্বাক,
নীরব হইল বালা ; কি দিবে উত্তর ?
বিষম বিপাক !

কহে শেষে ক্ষীণ হেসে গদগদ বচন --
"সুন্দর হরিণ,
চিত্রিত শরীর তার, সোনার বরণ ;—
যেয়ো একদিন !"

"আজ যাবে ?"—মুখ চেয়ে জিজ্ঞাসে চার্ব্বাক
ভরসা ও ভয়ে,
মঞ্জুভাষা কহে, "না, না, আজ ?—আজ থাক্ !"
—আধেক বিস্ময়ে !

সহসা সংবরি' আপনার,
কহে বালা চাহি মুখপানে
"শুনিনু মা-হারা মৃগ-শিশু,
মৃত মৃগী কিরাতের বাণে ;
ইচ্ছা করে পালিতে তাহায়,—
শিশু সে যে মা-হারা হরিণ -
পড় তুমি,—অবসর না থাকে তোমার,
বলিলে পালিতে পারি আমি সারাদিন

বল, আমি মা হ'ব তাহার !"
"তাই হোক্" কহিল চার্ব্বাক
"আমার স্নেহের ধনে তব স্নেহ-ধার
দিয়ো তুমি।" কহি' যুবা হইল নির্ব্বাক !

কৌতুকে চাহিয়া মুখপানে
মঞ্জুভাষা মঞ্জুলীলাভরে
চ'লে গেল মরাল-গমনে
জল নিতে ক্রৌঞ্চ-সরোবরে !

আশার বাতাসে, করি' ভর
ফিরে এল চার্ব্বাক কুটীরে,
ভাষাহীন আশার আবেশে
সুখভরে চুমে মৃগটিরে ।

"এ আনন্দ কে দিলে আমায় ?—
আশা-সুখে মন পরিপূর !
এত দিন চিনি নি তোমায় ;
আজ বটে দয়ার ঠাকুর !"

রাত্রি এল ; শয্যাতলে জাগিয়া চার্ব্বাক,
আশা-সুখে ধন্য মানে জন্ম আপনার ;
নির্গুণ মহেশে যেই করিয়াছে হেলা,
আনন্দ-মূর্ত্তিতে হিয়া পূর্ণ আজি তার ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৫৩ ॥

পদ্মার প্রতি

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে, তুমি নিজ পথ ;
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি; তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী !
অনাহূত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি !

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্যার মত লোকমাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র-ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে !
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি, স্তম্ভ ও গুম্বজে দিনরাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত !

তার প্রতি কোনো দিন ; সিন্ধুসখী ! হে সাম্যবাদিনী ,
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা ! কল্লোলনাদিনী !
ধনী-দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে ;

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে ;
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই !
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা ! অয়ি পদ্মা ! অয়ি বিপ্লাবিনী !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৫৪ ॥

বর ভিক্ষা

(জাপানী কবিতা)

চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম !
জানু পাতি' বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে ;
থরে থরে ফুটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে'।

"দাও, প্রজাপতি! দাও মোরে পতি,
দাও মোরে হেন বর,
গোপন সানুর মর্ম্মরসম ১২
যার কণ্ঠের স্বর—

সেই সানুদেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা!"
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল,
চন্দ্রমল্লি লেখা! ১৬

"দাও হেন স্বামী যে আমার পানে
চাহিবে সহজ সুখে,—
যে-চোখে শ্যামল প্রান্তর চায়
উষার অরুণ মুখে! ২০

ভালবাসা যার কানন উদার—
পাখী-ডাকা, ছায়া-ঢাকা"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
মুখে চেরী-ফুল আঁকা! ২৪

"দাও হেন বর, হাসে ভাষে যার
প্রাণে সান্ত্বনা আসে,
কাব্য-ভুবনে জোছনার মত
রহিবে যে পাশে পাশে, ২৮

স্নেহ হবে যার মধুর উদার
নিদাঘের শ্যাম-ছায়া!"
চন্দ্রমল্লি ওহারুর প্রাণে,
চেরী-চারু তার কায়া। ৩২

"দাও হেন পতি, যাহার মুরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো,
মরণে যে পর নয়,—

জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যায়!"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল মুরছায়।

"দাও সে যুবকে আছে যার বুকে
অঙ্কিত মোর নাম,
যদিও বলিতে পারিনে এখন
কবে তাহা লিখিলাম।

কোন্ সে জনমে; কোন্ সে ভুবনে,
কোন্ বিস্মৃত যুগে!"—
চেরী-ফুল সনে চন্দ্রমল্লি
জাগে ওহারুর বুকে!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ৫৫ ॥

ভক্তির যুক্তি

শুভ ফাল্গুন দেখা হ'ল মোর
এক কৃষকের সাথে,
পুলকে দেখিছে ক্ষেতের ফসল
হুঁকাটি লইয়া হাতে!

দেখিয়া আমারে নোয়াইয়া মাথা
কহিল, ঠাকুর, শোনো—
তুমি পণ্ডিত, আমি ত মূর্খ,
জ্ঞান নাই মোর কোনো।

পাড়ায় আজকে তর্ক হয়েছে
একটা বিষয় নিয়ে,
এই দুনিয়ার মালিক যে জন—
পুরুষ বটে, কি মেয়ে ?

ধর্ম্মরাজের দেয়াসী মহেশ
বলিয়াছে জটা নাড়ি'—
ধরার কর্ত্তা জগদীশ্বর
হইতে পারে কি নারী ?

আমি ত' অবাক ! প্রসব করেছে
এই যে বিপুল ধরা
শ্যামা মা আমার, এ কথা জানে না—
মাথায় গোবর ভরা !

জগত-জননী মা না হ'ত যদি
দোপাটি পে'ত কি ফোঁটা ?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী তার—
কদলা গরদ গোটা ?

শিখা কোথা পে'ত ময়ূরকণ্ঠী ;
রেশমী পোষাক টিয়া ?
ঝুঁটি কোথা পে'ত ছোট বুলবুলি
--বাঁধা লাল-ফিতা দিয়া !

ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে,
পারে সে সোহাগ নিতে—
টিপ্‌, কাজলেতে সাজাইতে পারে,
—দেখিনি ত' হেন পিতে।

সুমুখেতে দেখ দুষ্টু বোল্‌তা
সোনালী ঘুন্সী-পরা,
বকের কামিজ কিবা ইস্তিরি,
যায় না ময়লা করা!

ডোবার যে পানা—তাহারও পোষাক,
তাহাতেও ফুল-কাটা;
ওর-ও গায়ে দেখ সবুজ দোলাই—
ওই যে খেজুর-কাঁটা!

ভূতলে গগনে গিরি নদী বনে
দেখুক চাহিয়া কেহ—
চারিদিক দিয়া গড়ায়ে পড়িছে
মায়ের গভীর স্নেহ!

তুমিই, ঠাকুর, কর মীমাংসা—
বলিল সে হাসিমুখে;
আমি তার সেই কর্কশ কর
টানিয়া নিলাম বুকে!

বলিলাম, জেনো—ধর্ম্মক্ষেত্র
এই সে তোমার মাঠ,
নীরবে হেথায় তুমিই করেছ
বুকের চণ্ডীপাঠ!

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

॥ ৫৬ ॥

হয়ত

(১)

হয়ত আমার এ পথে আর
হবেনাক আসা,
দুধারে যাই রোপণ ক'রে
বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে,
অমল ক'রে যাই রেখে যাই
ক্ষণিক কাঁদা-হাসা!

(২)

সরায়ে দিই পথের কাঁটা—
ছড়ায়ে যাই ফুল,
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী
ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায় পায় যেন গো,
বন-বিহগের কণ্ঠে আমার
অমর হউক ভাষা।

(৩)

ভক্তি-বিহীন সম্বল-হীন
দুঃখী অকপট,
শক্তি নাহি গড়তে দেউল
সান্ত্বনারি মঠ!

দরদী এই দিনের হিয়া
নিঝরে থাক প্রণয় দিয়া,
হয়ত' কোনো তৃষিতেরি
মিটতে পারে তৃষা।

(৪)

জানিনে এ মানব-জনম
আবার পাব কিনা,
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি
প্রণয়-রাখীর চিনা।
অনুভূতির ছিন্ন সূত্র,
যাই রেখে যাই যত্রতত্র,
পারবে না যা করতে পরশ
কালের কর্ম্মনাশা।

(৫)

হয়ত' কারো হরবে ক্ষুধা
আমার তরুর ফল,
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ
অশ্রুদীঘির জল ;
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয়ত' কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে—
লোকটা ছিল খাসা।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

।। ৫৭ ।।

বহ্নিস্তুতি

তপন-তপ্ত, চির অতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি !
শিব-ললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা, তুমি দীপ-শিখা তন্বী ।
রক্তবসন, ভস্ম-আসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত-ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি !
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবনিশ্বর, ভস্মে শান্তি লভে ।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব-চিত্তে, আণব-নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি ।
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়-তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ ।
জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' উঠ দাবানলে।
ধুক্‌ধুক্ এই হৃদিমূলে তব ধিকি-ধিকি কৌতুক,
সাগর ডুবে'ও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক !
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ ;
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ ।
দুর্দ্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে
সব সম্বল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হ'য়ে !
আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই !
মিলন বিরহ, ভাব ও অভাব– যোগবিয়োগের কাজ—
থেমে গিয়ে যবে এবিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাহারি ভালে ?
হে সর্ব্বভুক, এ দীন শর্মার লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তার আশীষ-দাহনে দহ।'

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

॥ ৫৮ ॥

হাটে

(১)

হাটে হাটে আমি ঘুরে' যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ !
কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা,
কত যে মাঠের ছিন্ন কুসুমে
হাটের গলার মালা ;

॥ ২ ॥

আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে
বাতাসে অকস্মাৎ
মনের খাতায় উলটিয়া যায়
মাঠের শ্যামল পাত।
আঁখি মুদে' দেখি—মাথার ভিতর
ঘনায় শাওন-ঘোর,
নূতন ধানের ঢেউ দুলে যায়
বুকের শোণিতে মোর !
আঁখি মেলে' দেখি—চতুর কয়াল
মাপিয়া চলেছে মাল,
সূক্ষ্ম হিসাব, লোকসান লাভ—
কত ধানে কত চাল !

তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা,—
সর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
কত না মাঠের কাঁচা শ্যামলতা
পাণ্ডুর হ'ল পেকে',
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে
হাট নিল তারে ডেকে!

(৩)

সব্জী-বাজারে আসিয়া দেখি যে—
পড়িয়া হাটের ফাঁদে
ফলে-ফুলে-পাতে শীতের প্রভাতে
মাঠের শিশির কাঁদে।
সোটা-বাঁধা-বাঁধা লোটে লাউ-ডগা,
মোলাম্ পালম্ আঁটি,
মূর্চ্ছিত চিতে চাহে কি স্মরিতে
মাঠের কোমল মাটি।
সুদূর গোঠের শ্যাম-বার্ত্তা কি
স্মরিছে রে বার্ত্তাকু?
কচি বুক হাটে সুলভ করিতে
ফলে ফালা দিল চাকু!
মাটির বক্ষ খুঁড়ে' খুঁড়ে' তোলা
কত মূল, কত কন্দ,—
ধুয়ে' মুছে ডালি ভ'রেছে রে, তবু
র'য়েছে মাটির গন্ধ
টাট্‌কা ফলের মট্‌কিয়ে বোঁটা
দেখে লয় নির্য্যাস,—
গন্ধে তাহার ভেসে ভেসে আসে
মাঠের দীর্ঘশ্বাস।

হারায়ে হারায়ে গেরুয়া মাঠ কি
বিবাগিনী হ'ল, ভাই ?
কচি-বয়সেই ছাঁচি-কুমড়োকে
দু' হাতে মাখাল ছাই।

(৪)

হাটের মধ্যে নিরর্থ আমি—
এলোমেলো মোর হাঁটা,
বামে মাথা ঠুকে' চলিতে সমুখে
চোখে পড়ে মেছোহাটা।
মেছোহাটে ঢুকে' জনারণ্যের
নির্জ্জনতার মাঝে,
গোপনচিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে ?
কোন্ খাল-বিল নদী-নিবাসের
কি সজল-স্মৃতি-ঘায়
ডাঙার প্রবাসে কাতর কাতল্
থেকে থেকে খাবি খায়।
কোন্ সে নিতল শীতল পঙ্কে
ছিল পাঁকালের বাসা ?
ডালার কই যে ঘেমে উঠে ওই,
এখনো পোষে কি-আশা ?
খেলিয়া বেড়া'তে জলের দুলাল,
ঢেউয়ের আঁচলে ঢাকা,
সন্ধ্যার মুখে পদ্মার বুকে
জালে জড়াইল পাখা।
এখনো যে দেহ রূপোর পাত্ রে,
হীরের টুকরো আঁখি,—
মরণের শীত করে নিবারণ
বরফের কাঁথা ঢাকি'।

মেছোহাটে ঢুকে' জন-কল্লোলে
জল-কল্লোলই শুনি,—
নির্জ্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু হায় ঢেউ গুণি!
মাঠের বেদন জলের কাঁদন
হাটে যে মিলিল,—তাই
হাটে হাটে যে আমি ঘুরে' মরি বৃথা,
হাট করিনে রে ভাই!

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

॥ ৫৯ ॥

শিউলির বিয়ে

বিয়ের ফুলটি, ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেলবে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডাল্‌টি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে,'—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে,—
বেল-মালতী, জুঁই-চামেলী—এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের—যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর;
শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধটুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখ্‌ত তারে পাতার আড়াল থেকে।
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া-আসা,
বলেন, "বিয়ের বয়স হ'ল, রূপে-গুণে খাসা,
পাল্‌টি-ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল' যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।
বাপ তো তোমার রাজিই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
'গায়ে হলুদ' দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই!"
শিউলি বলে, "তাই যদি হয়, ঘটক তুমি যাও,
আমি যে স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে দাও!"
শুনে সবাই ছি ছি করে—"এমন দেখিনি!

কুলীন বলে' লজ্জাসরম একটু রাখে নি !"
সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাবুরা বললে মীটিঙ্ করে'—
শিউলিরা সব হ'লেন তবে আজ থেকে 'এক ঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাক্‌বে না জাত মোটে !
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা ! ভাবনা কিসের শুনি ?
ভোর না হতেই বিদেয় হব'—না হয় ত' এখ্‌খুনি !"

* * *

দখিণ-হাওয়া বললে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্—
গোলাপী-রং পরীর দেশে ঢাল্‌বি পরিমল।
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বলে
গাঁথ্‌বে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে।
শুকতারাটি ঘুমায় যখন রাত্রি-জাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুলবি মনোহর।
আল্‌গা তোমার বোঁটার বাঁধন খুলব নাকি, সই !"
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ কুসুম হই !"
জ্যোৎস্না এল জরীর চাদর ধূলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে ;
সাদা-মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে !
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বললে, "তোমার নেই পাউডার ?—দেখায় সে কি ভালো ?
রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি'
নিশুত্ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আসবে নেমে পরী-কুটুম্বিনী,

'বনে ব'সেই পারবে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয়না দেখে' জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—"চাইনে স্বপন, ভুলতে ধরণীরে।"
আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ঘুমেরি মাঝখানে,—
শিউলি শুনে শিউরি ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে—"ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
কোন্ জনারে সকল শোভা করবে সমর্পণ।
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি!
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি!
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেবতাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য-আশিস্ যে সে!
মেঘের মতন, শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়া'র ইয়ার সে নয়, গন্ধ-বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দূর্ব্বাদলশ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম।"
শিউলি বলে, 'থাম না তোরা, দুটি পায়ে পড়ি,
এখ্‌খুনি সব উঠ্‌বে জেগে, বল্‌বে—'গলায় দড়ি'!
সইতে আমি পারব না সে—তবু, দোয়েল ভাই,
কুলীন হয়ে'ও কেমন করে' এমন ঘরে যাই!
বুঝ্‌ছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিন-হাওয়া, আকাশ পেলেও থাকব না এইখানে!
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার।
তাই ত' আমি মনে মনেই হ'লাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হ'ল—ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্‌নি কপাল!—দেখ্‌তে না পাই তাকে,
জোচ্ছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!
বল্‌না তোরা—ভোর হ'ল কি? মিহিন কুয়াসায়
ছাদ্‌না-তলা দেয় কি ঢেকে ওড়নাখানি প্রায়?

সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার 'পর।"

* * *

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেঙে সবাই দেখে আসি'—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি !

—মোহিতলাল মজুমদার

॥ ৬১ ॥

আকিঞ্চন

দুঃখ যদি দিতে হয় দাও তবে দয়াময়,
 নিয়ে গিয়ে এমন ভুবনে—
যেখানে আনন্দ-গান, উৎসবের কলতান
 সারাদিন না পশে শ্রবণে !
যেথা নিত্য নাহি হেরি, সতত আমারে ঘেরি'
 উল্লাসের চল-নৃত্য চলে ;
যেখানে সম্ভোগ-সুখ গবাক্ষে বাড়ায়ে মুখ
 ব্যঙ্গ নাহি হানে পলে পলে।
যেখানে ফোটেনা ফুল, সুকণ্ঠ বিহঙ্গকুল
 গাহে না এমন মধু-গান,
চাঁদের আদর পেয়ে সোহাগে গিরির মেয়ে
 নাচিয়া তুলে না কলতান
সুখ যদি দিতে হয়, দাও তবে, দয়াময়,
 নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ-কাতর হেন
 আর্ত্তনাদ হায় পথে পথে !
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
 উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
 আমাদের উৎসব পানে।
হ'য়ে তরু-বুকহারা মুকুলিত লতিকারা
 সেথা যেন ভূমে না লুটায়।
ফুল যেন নাহি ঝরে, নদী যেন নাহি মরে,
 ঋতুরাজ পাখা না গুটায়।

—কালিদাস রায়

॥ ৬১ ॥

বাঙ্গালীর সাধ

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'

তরী হ'তে অবতরি' চলিলেন মহেশ্বরী
ভবানন্দ ভবনের পানে,
নৌকা বাঁধি' বটতলে ঈশ্বরী পাটনী চলে
পিছে পিছে সজল নয়ানে।
সূর্য্য বসিয়াছে পাটে, লোক নাহি চলে বাটে,
দূর গ্রামে বেজে ওঠে শাঁখ,
দিনের আলোক, বায়ে উড়ায়ে পাখার ঘায়ে,
উড়ে যায় বলাকার ঝাঁক।
"নৌকা ফেলি' কেন মিছে আসিস্ রে পিছে পিছে ?"
জননী ফিরিয়া ক'ন ডেকে—
"তোর তরী হ'তে নামি' পারের কড়ি ত' আমি
এসেছি সেঁউতি 'পরে রেখে।"
ঈশ্বরী পাটনী কয়, "দাও মাগো পরিচয়,
তুমি ত' সামান্য মেয়ে নও,—
হেরি' কার শ্রীচরণ ধন্য হলো এ জীবন,
জানিতে বাসনা—কও, কও।"
দেবী কহিলেন হাসি', "গাঙ্গিনী-তীরেই আসি'
দিয়াছি ত' নিজ পরিচয়,
বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ,
যাতে তোর দূর হলো ভয়।"
পাটনী কহিল, "তাতে বুঝেছি স্বামীর সাথে
কলহ করিয়া অভিমানে,
তুমি কুলীনের মেয়ে সতীনের দাগা পেয়ে
চলেছ মা আশ্রয়-সন্ধানে।
বলনি ত' আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছু,
কে মা তুমি, জানিবারে চাই,
সাধন-ভজনহীন আমি এ পাটনী দীন,
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই।"

হাসিয়া জননী ক'ন, "ডাকে মোরে ত্রিভুবন
জননী বলিয়া,—শোন্ তবে,
তুষ্ট আমি তোর 'পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর,
যা চাহিবি তাই তোর হবে।"
পাটনী চিনিয়া মায় অলক্ত-রঞ্জিত পায়
প্রণমি কহিল জোড়হাতে,
"যদি কৃপা হলো হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।"
বক্র শীর্ণ আলি-পথ চলিয়াছে সর্পবৎ,
দুই পাশে শ্যাম ধান্য-ভার,
দাঁড়াইয়া তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে,
নেয়ে পড়ি' পদতলে তাঁর।
দেবী কহিলেম, "নেয়ে, এমন সুযোগ পেয়ে
এই শুধু করিলি প্রার্থনা!
এ-ত অতি তুচ্ছ কথা, এরি তরে কাতরতা ?
আর কিছু নাহি কি কামনা ?
মুক্তি চাস্ ? মোক্ষ চাস্ ? চাস্, চির-স্বর্গবাস ?
শত পুত্র চাস্ যদি পাবি ;
পরমায়ু বয়-শত, রাজ্য ধনরত্ন যত,
কিবা চাস্—বল্, পুন ভাবি।"
জোড়হাতে নেয়ে কয়, "মরিতে করি না ভয়,
মোক্ষ, মুক্তি ?—কাজ নাই তা'তে।
রাজ্যধন নেব কেন ? আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।"
অন্নপূর্ণা ক'ন, "নেয়ে, সোনা ফেলে এলি ধেয়ে,
যে সোনা এসেছি নায়ে রাখি,
সে সোনা সামান্য নয়, যাবে তা'তে দৈন্য-ভয়—"
নেয়ে কয় ছলছল আঁখি—
"সোনা নিয়ে কি মা হবে ? জমিদার কেড়ে লবে,
লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে।
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।"

অন্নদা তথাস্তু বলি'   অদৃশ্য হ'লেন ছলি'—
নেয়ে চায় অবাক নয়ানে,
স্বপ্নভঙ্গে চলে ধেয়ে,   হৃষ্টচিত্তে বর পেয়ে,
আপনার কুটিরের পানে।

—কালিদাস রায়

॥ ৬২ ॥

বাঙ্‌লা মা

আমার শ্যামল-বরণ বাঙলা মায়ের
রূপ দেখে যা আয়রে আয়!
গিরি দরী বনে হাটে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে,
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে
বৈরাগিনী বীণ্ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটি।
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণার সে বারি ছিটায়॥
কাজ্‌লা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে ল'য়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়॥
নদীর স্রোতে পাথর-নুড়ির কাঁকণ-চুড়ি বাজছে যে তার;
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপ্‌টি প'রে সন্ধ্যাতারার;
ঊষার গাঙ্গে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর-বেলায়॥
হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে;
ভাটির স্রোতে গায় ভাটিয়াল; গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

॥ ৬৩ ॥

"শাত-ইল আরব"

শাতিল-আরব ! শাতিল-আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।
যুঝেছে, এখানে তুর্ক-সেনানী,
য়ুনানী, মেস্‌রী, আর্‌বী কেনানী ;—
লুটেছে এখানে মুক্ত আজাদ বেদুঈন্‌দের চাঙ্গা শির।
নাঙ্গা-শির,
শম্‌শের হাতে, আশু-আঁখে হেথা মূর্ত্তি দেখেছি বীর-নারীর !
শাতিল-অরব। শাতিল-আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
'কূত আমারা'র রক্তে ভরিয়া
দজ্‌লা এনেছে লোহুর দরিয়া ;
উগারি' সে খুন তোমাতে দজ্‌লা নাচে ভৈরব 'মস্তানী'র,
ত্রস্তা-নীর
গর্জ্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত—"শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখীর !"
দজ্‌লা-ফোরাত-বাহিনী শাতিল !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
বহায়ে তোমার লোহিত বন্যা
ইরাক আজমে করেছ ধন্যা ;—
বীর-প্রসূ দেশ হ'ল বরেণ্যা মরিয়া মরণ মর্দ্দমীর।
মর্দ্দ বীর—
সাহারায় এরা ধুঁকে' মরে তবু পরে না শিকল পদ্ধতির।
শাতিল আরব ! শাতিল আরব !! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
দুশ্‌মন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তবে তরঙ্গে করে ঝিল্‌-মিল্‌,
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পিয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর !
জিন্দা বীর—
'জুলফিকার' আর 'হায়দারী' হাঁক হেথা আজো
হজরত্‌ আলির—

শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।
ললাটে তোমার ভাস্বর টীকা
বসূরা-গুলের বহ্নিতে লিখা,—
এ যে বসোরার খুন-খারাবা গো রক্ত-গোলাব-মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর!
খঞ্জরে ঝরে খর্জ্জুর-সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত-শির!
শাতিল-আরব! শাতিল-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমারি তীর।

ইরাক বাহিনী! এ যে গো কাহিনী!—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!" বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর?
রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোটা ভক্ত-বীর,
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

—কাজি নজরুল ইসলাম

॥ ২৪ ॥

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা! দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।
দুঃসহ দহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ-রস-প্রাণ—
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান।

যতবার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি' কর পান। শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি' তুমি বল, "অমৃতে কি ফল?"

"জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা—
রে দুর্ব্বল! অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবী তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।

কাঁটা কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা!"
মৃত্যু-পথ যাত্রিদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁস হাসিতে হাসিতে।

নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বলাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!
লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছ টানি'
ধূলিতলে রুদ্ধ রোষে করাঘাত হানি'।

ওরে মোর সর্ব্বনাশা দারিদ্র্য অসহ!—
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদো অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাঁশী?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।

—কাজী নজরুল ইসলাম

॥ ৬৫ ॥

রূপাই

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর ! কিসের রঙীন ফুল ?
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া ;
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু ;
গা'খানি তা'র শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু ;
বাদল ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্‌ !
কচি ধানের তুলতে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি।
'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।'
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময় ;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব ক'রেছে জয় !
সোনায় যে জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার ?—
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,—
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে কালো তা'র গাঁও,
সেই কালোতো সিনান করি উজল তাহার গাও !
আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবাই টানাটানি !
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দী বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে

বুড়োরা কয়,—"ছেলে নয়, ও 'পাগল' লোহা যেন !
রূপাই যেমন বাপের বেটা, কেউ দেখেছ হেন ?
যদিও রূপা নয়কো রূপাই,—রূপার চেয়ে দামী
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী !"

—জসীম উদ্দিন

॥ ৬৬ ॥

প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর !
যে মোরে করিল পথের বিরাগী—
পথে পথে ফিরি আমি তারি লাগি',
দীঘল রজনী তার তরে জাগি' ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর !
আমার এ কূল ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি।
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম-ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি'
রঙীন ফুলের সোহাগ জড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি' সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

—জসীম উদ্দিন

॥ ৬৭ ॥

কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে   সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎ-রবির সোনার আলো ঝরিছে,
আজ প্রভাতে এতক্ষণে   রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে।

মেঘ্‌লা-দিনের ওড়না ফেলি'   চাইছে ভুবন নয়ন মেলি',
রাঙামাটি রঙিন আলোয় বাঁচিল ;
আমার শুধু চোখের কাছে   আজকে ক'টা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিল-ও।

আশ্বিনে এই নূতন রোদে   মাত্‌ল যে মন কোন্ আমোদে,
কোন্ প্রাণে আজ উঠ্‌ল যে গান গাহি' রে,
কেমন ক'রে বুঝাই, প্রাতে   পেলাম দু' হাত আঙিনাতে—
মাঠ ভ'রে যা পাওনি তুমি বাহিরে!

আজকে আমার সকল দিকে   ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল যত পুরাণো,
কেউ বা কালো, কেউ বা মেটে,   লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে আজ যায় না নয়ন ফিরানো!

এই পাঁচিলে এম্‌নি ভাবে   কতই গেছে, কতই যাবে
শরৎ-রবি সোনার তুলি বুলায়ে,
দূরের স্বপন পাখায় মাখি'   বস্‌ল হেথায় কতই পাখি,
বস্‌বে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে।

এই পাঁচিলে কতই রেখায়   বাদল-বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি কতই আছে রচনা,
ক্বচিৎ কভু হোথা হেথা   বুঝেছিলাম তাদের কথা,
তাদের প্রসাদ—তাদের প্রাণের যাচনা।

আজকে তাদের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার ঢুক্‌ল আসি',
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া,
আর পূজা চায় সবাই যেন, শেওলা জলে পান্না হেন,
রাঙা-ইঁট আজ উঠ্‌ল দ্বিগুণ রাঙিয়া ! ২৮
এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যি মানায়,
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি ;
সকল দিনের দৈন্য নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি,'
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী ! ৩০

ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এম্‌নি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে। ৩৬
সহসা সেই শুভক্ষণে, সব কিছু হয় মধুর মনে,
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরাণো নয় নূতনতরো,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে। ৪০
আশ্বিনে সেই দিন এসেছে, আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা ?
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে — তোমরা কি তার সবটা পাবে ?
হেথায় আমি একটুও কি পা'ব না ? ৪৪
বাইরে আলো, দুষ্টু ছেলে— মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে—
ধরার নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে,
হেথায় আলো, লক্ষ্মী-মেয়ে করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভালো না বেসে ! ৪০

—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ৬৮ ॥

আক্‌বর

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে,
একান্ত বিজন।
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।
নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই ;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন—
চমকিয়া চাই।
জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হ'য়ে ধীরে,
নাহিক স্পন্দন ;
বন্দী হয়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন !
কত দিবসের ব্যথা, জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া ;
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল
উঠে শিহরিয়া !
তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন !—
এ ভারত-ভূমি,
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,—
বেঁধে দিবে তুমি !
সমাজ-আচার-ভেদ, ধর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে ;
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন এক সাথে হবে
জীবন-মরণ !
হায় ! টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি',
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রুর সর্পসম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'।

বিদ্বেষ, সমুদ্রসম আস্ফালিয়া করিছে গর্জ্জন
ছাইয়া হৃদয় ;
নীরব আকাশ-তলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন,
রক্তধারা বয় !
ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিষ্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভা'য়ের শোণিতে ;
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা শুধু ভেঙ্গে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে।
স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি' পড়ে অহর্নিশ,
উঠে শূন্য-পানে
ক্রন্দন-গর্জ্জন রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি',
কাহার সন্ধানে ?
তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি ;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি !
তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে ;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে !
হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার ;
উঠুক মিলন মন্ত্র সাম্যবাদ কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার !
হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

হুমায়ুন কবীর

'কাব্য-মঞ্জুষা'র

উন্মোচনী

[ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য]

কবিতার কথা

॥ কবিতা কাহাকে বলে ॥

কবির প্রাণে, প্রকৃতির নানা দৃশ্য, অথবা মনুষ্য-জীবনের নানা ঘটনা যে-সকল ভাবের উদ্রেক করে, তাহাকে ছবির মতো প্রত্যক্ষ এবং গানের মতো মধুর করিয়া যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য তিনি প্রকাশ করেন সাধারণতঃ তাহাকেই আমরা কবিতা বলি। এইরূপ রচনা পাঠ করিলে আমাদের প্রাণেও সেই সকল ভাবের সঞ্চার হয়—কবির প্রাণের সেই আনন্দ-বিষাদ, আশা-উৎসাহ, বিস্ময়-কৌতুক আমরাও অনুভব করি; এবং যে কবিতার যে ভাব—তাহা যদি খুব সুস্পষ্ট, সুন্দর ও যথাযথভাবে, ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে সেই কবিতা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

॥ পদ্য ও গদ্য ॥

ছন্দ ও মিল থাকিলেই রচনাকে পদ্য-রচনা বলা যায়, এবং তাহা যে গদ্য নয়, তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু ছন্দ ও মিল থাকার জন্য রচনাকে পদ্য নাম দেওয়া গেলেও, তাহা 'কবিতা' না হইতেও পারে; কারণ, যাহাতে কোন একটি ভাব বা কল্পনা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা যেমন ভাল কবিতা নয়—তেমনই, যাহার বিষয় এমন যে, গদ্যেই তাহা প্রকাশ করা যাইত—তাহাকে কবিতা নাম দেওয়া যায় না। এইজন্য 'পদ্য' ও 'কবিতা' এই দুইটি শব্দের অর্থ যে এক নয়, তাহা মনে রাখা দরকার—কোন কিছু পদ্যে লিখা হইয়াছে, এইরূপ বলা যায় মাত্র; অর্থাৎ ও-দুইটা নাম রচনা-রীতির নাম মাত্র—ইংরাজীতেও পদ্যের নাম Verse, কবিতার নাম Poem. এখন দেখিতে হইবে, রচনা এই দুই রকমের হয় কেন?—তোমরা ছেলেবেলা হইতে ইংরাজী ও বাংলা অনেক কবিতা এবং গদ্যরচনাও পড়িয়াছ; অতএব, এই দুই ধরণের রচনার পার্থক্য কি, তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। কবিতা পড়িয়া আনন্দ আমরা পাই—যেমন আনন্দ আমরা গান শুনিয়া ছবি দেখিয়া পাই; গদ্য বলিতে যাহা বুঝি তাহাতে ঠিক এইরূপ আনন্দ পাই না, জ্ঞানের বা শিক্ষালাভের আনন্দ পাই। গদ্য আমাদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান করিয়া তোলে, কবিতা আমাদিগকে ভাবুক ও সহৃদয় করে।

॥ কবিতা কেমন করিয়া পড়িতে হয় ॥

অতএব, আমরা গল্প যে উদ্দেশ্যে পড়ি, কবিতা সেই উদ্দেশ্যে পড়ি না; এইজন্য কবিতা পড়িবার নিয়মও স্বতন্ত্র। প্রথমত, ছন্দ রহিয়াছে বলিয়া উহা আবৃত্তি করিয়া পড়িতে হয়; নতুবা ছন্দের প্রয়োজন কি? ছন্দের কথা পরে বলিব; এক্ষণে শুধু ইহাই বলা আবশ্যক যে, কবিতার ভাব-অর্থ বুঝিবার আগে তাহাকে কানে শুনিতে হইবে। কানে শুনিতে শুনিতেই ভাবটি মনের মধ্যে প্রবেশ করে—অন্ততঃ কবিতাটির ভাব-অর্থ বুঝিবার মতো অবস্থা ঐ ভাষার আওয়াজ শুনিয়াই মনের মধ্যে জাগে। কবিতা আবৃত্তি করিতে যে ভাল লাগে তাহার কারণ কেবল ছন্দই নয়—শব্দের ধ্বনির গুণে ছন্দ আরও মধুর হইয়া উঠে। অতএব, কবিতা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভাল করিয়া পড়িতে হইবে। এখানে ভাল করিয়া পড়িবার নামই—ভাল করিয়া বুঝা। কারণ কবিতার ভাবটাই আসল; যত অর্থ বা যত শিক্ষার বিষয় তাহাতে থাকুক—সেই সকলের মূলে যে ভাবটি আছে কেবল তাহাই আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত হওয়া চাই। এজন্য কথার শুধু অর্থই নয়—কথার সৌন্দর্য্যও বুঝিতে পারা চাই। কথার সৌন্দর্য্য যে কত রকম হইতে পারে, তাহা ভাল কবিতা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি। কবিরা বড় সাবধানে শব্দ প্রয়োগ করেন; কারণ, ছন্দের সঙ্গে মিলিয়া তাহার আওয়াজটি মধুর হওয়া চাই; আবার এক একটি কথাতেই, বা খুব সুনির্ব্বাচিত অল্প কথাতেই ভাবটি খুব যথার্থ ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হওয়া চাই; কথা যত অল্প হয়, তাহার ভাব ততই গভীর হইয়া থাকে। অতএব, তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, গদ্য পড়িবার সময় ঠিক সেইদিক নয়—আর একদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; কথার কেবল অর্থ নয়, তাহার ধ্বনির সৌন্দর্য্য এবং তাহার ভাবের অপূর্ব্বতা আরও ভাল করিয়া অন্তরে গাঁথিয়া লইতে হয়। কবিতা পড়িবার সময় প্রথমেই কথার অর্থের জন্য অভিধান দেখিবে না—কানে ও মনে যে কথাটি, যে লাইন বা লাইনগুলি পড়িবামাত্র ভাল লাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ সেইগুলিকে পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিবে; পরে ভাল লাগার কারণ বুঝিয়া সেই কথাগুলি অভ্যাস করিবে। দেখিবে একটি শব্দের পাশে আর একটি শব্দ এমন ভাবে রহিয়াছে যে, তাহাতেই কথাগুলি শুনিতে যেন মিষ্ট, অর্থ তেমনই সুন্দর হইয়াছে; হয়ত বা, কথাটি এক নূতন অর্থে ব্যবহৃত

হইয়াছে—তাহাতেই কথাটি এমন মনে লাগিতেছে। এমনই করিয়া কবিতার ভাষা ও ভাব—উভয়ের সৌন্দর্য্য—বুঝিবার চেষ্টা করিবে; নূতন ও সুন্দর কথাগুলি কণ্ঠস্থ করিবে; যে লাইনগুলি খুব ভাল লাগিয়াছে তাহাও স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে। কবিতাটির মূল ভাব কি তাহা তোমরা নিজেরাই একরূপ বুঝিবে—যেটুকু বুঝিতে পার, আপাততঃ তাহাই যথেষ্ট। তারপর আবশ্যক হয়, শিক্ষকের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইবে। মোটের উপর, কবিতাটি বার বার পড়িয়া নিজেই যতটা পার বুঝিতে চেষ্টা করিবে, প্রথমেই তাহার অর্থ সম্বন্ধে ভীত ও চিন্তিত হইবে না; কেবল পাড়বার আগে যদি কেহ কবিতাটি ভাল করিয়া পাঠ করিবার কৌশলটি দেখাইয়া দেন; সেইটুকু মাত্র সাহায্য পাইলে খুব ভাল হয়। আমি তোমাদিগকে একটা বিষয় সাহায্য করিব,—কবিতার মধ্যে যদি কোন লাইন, কোন কথা বা শব্দ, বিশেষ লক্ষ্য করিবার এবং মনে রাখিবার মতো হয়, তবে তাহা দেখাইয়া দিব।

॥ কবিতা কয় প্রকার ॥

সব কবিতা যে এক শ্রেণীর নয় তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। কোন কবিতায় কবি কেবল কোন বস্তুর রূপ বর্ণনা করিতেছেন; কোনটিতে এমন একটি ঘটনা বা চরিত্র বর্ণনা করিতেছেন যাহা আমাদের চিত্তে কৌতুক, বিস্ময় অথবা প্রশংসার ভাব জাগায়; কোনটিতে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকা হইয়াছে। কোনটিতে কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্যই নয়—সেই দৃশ্য দেখিয়া কবির অন্তরে যে বিশেষ ভাবটি জাগিয়াছে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। কোন কবিতায় কবি মনুষ্য জীবনের মহৎ আদর্শে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন; কোনটিতে ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের মনকে সজাগ করিয়া উপমা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা নানা উপদেশ দিতেছেন। এইরূপ নানা রকমের কবিতাকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম,—যে সকল কবিতা খুব বড় এবং যাহাতে একটা গল্প বলা হইতেছে—এ ধরণের কবিতাকে 'মহাকাব্য' অথবা 'কাহিনী-কাব্য' বলা যায়। এই পুস্তকের সকল কবিতাই ছোট—অর্থাৎ খণ্ড-কবিতা; খণ্ড-কবিতার আর এক নাম 'গীতি-কবিতা'। এই 'গীতি-কবিতা' আর এক শ্রেণীর কবিতা। গীতি-কবিতার লক্ষণ এই যে, তাহাতে বাহিরের ঘটনা বা বস্তু, বা মানুষের বাহিরের পরিচয়টাই বড় নয়

সেই সকলের মধ্যে কবি যাহা অনুভব করেন, কিংবা—বাহির হইতে নয়, কবির নিজেরই অন্তরে যে সকল ভাবের উদয় হয়—সেই সকল ভাবই সুন্দর ছন্দে, মধুর আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কোন একটি ঘটনা বা চরিত্র লইয়া, ছোট গল্পের মতো করিয়াও একরকম গীতি কবিতা লিখা হয়; সেখানেও গল্প বড় নয়, গল্পের ভাব ও ছন্দ এবং সুরটাই বড়; তাই সেইরূপ গীতি-কবিতাকে—"গীতি-কথা" নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই পুস্তকে তেমন কবিতাও দেখিতে পাইবে। যে-সকল কবিতায় নীতি উপদেশ আছে, তাহাও 'গীতি-কবিতা'র আকারে রচিত হয় বটে, কিন্তু তাহাকে 'নীতি-কবিতা' নাম দিলেই ভাল হয়; সেইরূপ কবিতা পড়িলেই চিনিতে পারিবে। সর্ব্বশেষে আর এক রকমের কবিতার উল্লেখ করা দরকার—এই পুস্তকে তেমন কবিতা দুই চারিটি আছে। ইহাদিগকে ভগবদ্ভক্তিমূলক, বা ভক্তিমূলক কবিতা বলা যাইতে পারে। ইহাও রীতিমত গীতি-কবিতা; কারণ ইহাতেও কবির অন্তরের একটি গভীর ভাব ব্যক্ত হয়। তফাৎ এই যে, সেই ভাব সাধারণ কবিতার ভাব নয়। সে ভাব খুব উচ্চ এবং পবিত্র হইলেও, অন্য সকল ভাবের মতো সহজেই সকলের প্রাণে জাগে না। আশা করি, সংক্ষেপে এই যাহা বলিলাম, ইহা হইতেই কোন্ কবিতা কোন্ শ্রেণীর—তাহা বুঝিতে পারিবে; এবং তাহাতে যেমন প্রত্যেক শ্রেণীর বিচার তাহারই দিক দিয়া করিতে পারিবে, তেমনই তোমাদের কাহার কোন্ কবিতা ভাল লাগে, তাহাও জানিতে পারিবে।

॥ বাংলা কবিতার ছন্দ ॥

এইবার কবিতা পড়িবার আগে যাহা জানা সবচেয়ে বেশী দরকার, সেই ছন্দের কথা বলিব। এখানে আমি ছন্দের রীতিমত ব্যাকরণ লিখিব না; যাহাতে তোমরা কবিতাগুলির ছন্দ ঠিক রাখিয়া পড়িতে পার তাহার জন্য যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় এবং সংক্ষেপে বাংলা ছন্দের একটি পরিচয় দিব।

প্রত্যেক কবিতার প্রথম লাইনটি পড়িতে গেলেই দেখিবে—কথাগুলি একটানা পড়া যায় না, মধ্যে মধ্যে ছেদ দিয়া পড়িলে পড়ার আর কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু দুই-চারিটি পুরানো ছন্দের কবিতা ছাড়া, আধুনিক কালে—রবীন্দ্রনাথের যুগে—বাংলা কবিতায় যেসব নূতন ছন্দের আমদানী হইয়াছে তাহাতে ঐ প্রথম লাইনের ছেদগুলি সব সময়ে সহজে ধরা যায় না, তাই অনেকে কবিতা ঠিকমত পড়িতেই পারে না। আমি এই ছেদগুলি কোন্ কোন্ ছন্দে কেন কোথায় পড়ে, তাহাই বুঝাইয়া দিব, তাহা হইলেই কবিতার ছন্দ বুঝিয়া পড়িতে পারিবে।

'ছন্দ' বলিতে এক রকম মাপ (measure) বুঝায়। গদ্যের লাইনের কোন মাপ নাই—কবিতার লাইনের মাপ আছে। আমাদের কবিতার ছন্দের মাপ হয়—অক্ষর গণিয়া। কবিতার এক একটি লাইনকে 'চরণ' বলে; প্রত্যেক চরণের এইরূপ মাপ থাকে, যেমন—১০, ১২, ১৪, ১৮, ২২ অক্ষরের চরণ। বাংলা পুরানো ছন্দের মধ্যে প্রধান—'পয়ার' ও 'ত্রিপদী'; 'পয়ার' এই রকম—

মহাভারতের কথা । অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে । শুনে পুণ্যবান ॥

ইহার প্রত্যেক লাইন বা চরণে ১৪ অক্ষর আছে, লাইনের মধ্যে একটি মাত্র ছেদ আছে—৮ অক্ষর পরে। এই ছেদই ছন্দ পড়িবার ছেদ, ইহার নাম 'যতি' অর্থাৎ থামিবার জায়গা—ইংরেজীতে 'caesura' বলে। কিন্তু

আসলে থামিতে হয় লাইনের শেষে—মাঝের ঐ থামাটুকু ছন্দ পড়িবার জন্য দরকার। এই ছন্দে, ঐ দুই লাইনে এক একটি কবিতা সম্পূর্ণ হয়; দুই লাইনে মিল থাকাও চাই—প্রথম লাইনের শেষে অল্প এবং দ্বিতীয় লাইনের শেষে পূর্ণ বিরাম বা Pause. বড় কবিতা লিখিতে হইলে এই রকম জোড়ার লাইন গাঁথিয়া গেলেই হয়। 'ত্রিপদী'তে দুইটি ছেদ থাকে, অর্থাৎ 'পয়ারে'র যেমন প্রত্যেক চরণ দুইটি পদ থাকে, 'ত্রিপদী'তে তেমন তিনটি পদ থাকে। পদগুলি পৃথক করিয়া লিখা থাকে বলিয়া পড়াও খুব সহজ—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

কিংবা—

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥

এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, ইহার চরণ দুইটি কত বড়—ঐ দাঁড়ি মিলের চিহ্নও বটে। মধ্যে যে দুইটি করিয়া ছেদ আছে, তাহাতে প্রত্যেক পদের অক্ষর এবং চরণের মোট অক্ষর গণিয়া দেখ; আরও দেখ, ইহার চরণের প্রথম দুইটি পদে মিল থাকে, আবার না থাকিতেও পারে। যাহা হউক, এই ছন্দের ছেদ অতিশয় স্পষ্ট এবং ইহার মাপের নিয়মও খুব সহজ, অতএব এই পুরানো ছন্দ সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও এইরূপ কবিতা অনায়াসে পড়িতে পারিবে।

কিন্তু আধুনিক কবিতার নূতন ছন্দ পড়িবার সময় তাহার চরণের ছেদগুলি সব সময়ে ধরা যায় না; কারণ এখানে যতি ছাড়াও আর এক রকমের নিয়মিত ছেদ আছে। এই ছেদ খুব অল্প হইলেও কবিতা-আবৃত্তির পক্ষে লক্ষ্য রাখা দরকার, তাই এইরূপ ছেদের নিয়ম জানিয়া রাখা ভাল। পুরাণো ছন্দের চরণে ছেদ পড়ে এক একটি 'পদে'র পরে, তাহাকেই

'যতি' বলে। এ ছন্দের চরণে সেইরূপ যতি ছাড়া, প্রতি 'পর্ব্বে'র পরে একটু ছেদ পড়ে। পর্ব্ব ও পদে তফাৎ কি? দুই-ই ছন্দ-অনুসারে চরণের যে ভাগ হয়—সেই ভাগ; 'পয়ার' ও 'ত্রিপদীর' পদ ভাগ দেখিয়াছ, এই নূতন ছন্দের ভাগ কিরূপ, অর্থাৎ ছেদগুলি কোথায় পড়ে দেখ—

(১) চিত্তহারিণী | জাপানী বালিকা ॥ শুহারু তাহার | নাম

(২) নন্দপুর | চন্দ্র বিনা ॥ বৃন্দাবন | অন্ধকার

(৩) ছায়া নামে | তমালের | বনে বনে

এইরূপ ভাগকে 'পর্ব্ব' নাম দিয়াছি। পদ ও পর্ব্বে তফাৎ কি তাহা লক্ষ্য কর। পদগুলি পর্ব্বের অপেক্ষা বড় হইতে পারে এবং যেগুলি ঠিক এই রকম মাপের—যেন ছক্-কাটা হয় না। পদ সাধারণতঃ ৬, ৮, ১০, অক্ষর থাকে, একই চরণে এইরকম ছোটবড় পদও থাকে ; পর্ব্বে ২, ৪, ৫ অক্ষর থাকে, কিংবা ২+৩, ৩+৩ এইরূপ যোগ দেওয়া অক্ষর-সংখ্যাও থাকে, কিন্তু পর্ব্বগুলি সব এক মাপের হইয়া থাকে। এইজন্য কেবল একটি পর্ব্বের মাপ জানা থাকিলেই হইল, ঠিক সেই মাপে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ ছেদ দিয়া পড়িলেই ছন্দটি ধরা যায়। এখানেও চরণের মধ্যে যেখানে বড় ছেদ বা যতি আছে, সেখানে আমি (॥) এরূপ ডবল দাঁড়ি-চিহ্ন দিয়াছি। আরও একটি কথা আছে। পর্ব্বের অক্ষর গণিবার সময় যুক্ত অক্ষরকে অক্ষর ধরিতে হইবে—যদি তাহা শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকে, যেমন 'নন্দপুর'—চার অক্ষর নয়, পাঁচ অক্ষর ; 'চিত্তহারিণী'—পাঁচ অক্ষর নয়, ছয় অক্ষর। আর দেখিবে এই ছন্দে প্রায়ই চরণের শেষের পর্ব্বটি পুরা না হইয়া খণ্ড পর্ব্ব হয়—যেমন, উপরের ঐ প্রথম উদাহরণে দেখিতেছ।

অতএব এ পর্য্যন্ত দুই জাতের ছন্দ দেখিলে (১) **পদ ভাগের ছন্দ** এবং (২) **পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ**। কিন্তু আরও একজাতের ছন্দ আছে—সেও পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম অন্যরূপ। এই ছন্দের প্রত্যেক পর্ব্বে চারিটি অক্ষর থাকে—এখানে অক্ষরের হিসাব কেবল স্বরান্ত বর্ণগুলি লইয়া, গণিবার সময়ে হসন্ত-বর্ণ বাদ দিতে হয়, যেমন—

পায়ের তলায় | নরম ঠেক্‌ল | কি ?
শুনতে যাব | ভারত কথা ॥ রামায়ণের | গান
সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা ॥ খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি

পর্ব্বের অক্ষর সোজাসুজি গণিতে গেলে দেখিবে—কোনটায় ৪, কোনটায় ৫, আবার কোনটায় ৬ অক্ষর আছে; কিন্তু হসন্ত-বর্ণগুলি যদি বাদ দাও তবে দেখিবে, সর্ব্বত্র চারিটি অক্ষরই আছে, যেমন—পায়ে(র) তলা(য়); শু(ন্)তে যাব, নর(ম্) ঠে(ক্)ল; দিনে(র্) খেলা। এ পর্ব্বের যুক্ত-অক্ষরও দুই অক্ষর নয়। এই ছন্দকে 'ছড়ার ছন্দ' নাম দিলেই ভাল হয়, কারণ, যত পুরাণো ছড়া এই ছন্দেই রচিত হইত, যেমন—

বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর ॥ নদী এল | বান

এ ছন্দের জাত যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহার কারণ, ইহার ভাষাটা সাধু ভাষা নয়, চল্‌তি ভাষা। এইজন্য দেখিবে, পড়িবার সময় প্রত্যেক পর্ব্বের প্রথম অক্ষরটিতে একটা ঝোঁক বা উচ্চারণের জোর পড়ে—ইংরাজীতে accent-এর মতো; যেমন—

| | | |
বিষ্‌টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান
| | | |
সাঙ্গ হ'লে | দিনের খেলা | খেয়ে চারটি | তাড়াতাড়ি

প্রত্যেক পর্ব্বের গোড়ায় এই রকম একটু জোর দিয়া পড়িলে ছন্দটি কানে বেশ বাজিয়া উঠিবে। এ ছন্দেও 'খণ্ড-পর্ব্ব' থাকে। তাহা হইলে বাংলা ছন্দ পড়িবার সময়ে ঐ পদ আর পর্ব্ব ভেদ লক্ষ্য করিয়া, সেই অনুসারে চরণগুলির ছেদ ঠিক রাখিয়া পড়িতে হইবে।

দেখা গেল বাংলা ছন্দ তিন জাতের—(১) **পদ ভাগের ছন্দ**, যেমন—পুরাণো 'পয়ার', 'ত্রিপদী' প্রভৃতি। (২) **পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ** এবং (৩) **ছড়ার ছন্দ**, শেষেরটিও পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ বটে, কিন্তু এ ছন্দ চল্‌তি-ভাষার ছন্দ বলিয়া ইহার পর্ব্বগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি অন্যরূপ। নীচে ঐ তিন বিভিন্ন ছন্দের কয়েকটি চরণ তুলিয়া দিতেছি—দেখ দেখি, কোন্‌টির কি ছন্দ :—

(১) ভোরের বেলা শূন্য কোলে, ডাকবি যখন খোকা ব'লে

(২) সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলার মাটি

(৩) মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি,

দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ।

(৪) কৌতুকে ঘোমটা হ'তে
মুচকিয়া মৃদু হাসি
নব-বধূ চারিদিকে চায়।

(৫) ফুরায়ে গেল ধীরে বিবাহ উৎসব,
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব।

—এই শেষের লাইন দুইটিও পর্ব্ব-ভাগের ছন্দ। সাতের পর ছেদ, এবং সাতও তিন-চারে সাত; অর্থাৎ এ পর্ব্ব—ডবল পর্ব্ব।

আর এক প্রকার ছন্দের একটু পরিচয় দিব। এ ছন্দ বাংলা ছন্দ নয়—সংস্কৃতের অনুকরণ অতি প্রাচীন হইতে আধুনিক কবিতায় পর্য্যন্ত, মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছে। ইহার নাম মাত্রা-ছন্দ; অর্থাৎ, ইহাতে অক্ষর না গণিয়া মাত্রা; গণিতে হয়। মাত্রা কি? প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চারণ কাল এক এক মাত্রা এখানে অক্ষর অর্থে স্বরান্ত বর্ণ বা syllable; যদি তাহার পরে যুক্ত অক্ষর থাকে কিংবা তাহাতে আ-কার, ঈ-কার, এ-কার প্রভৃতি দীর্ঘস্বর যুক্ত থাকে, তবে সেই অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরিতে হইবে; পড়িবার সময় ঐ দুই-মাত্রায় অক্ষরগুলি বেশ টানিয়া উচ্চারণ না করিলে ছন্দ মিলিবে না। কিন্তু বাংলায় এইরূপ দীর্ঘস্বর থাকিলেই অক্ষরটার মাত্রা সব সময় ডবল হয় না—ছন্দের প্রয়োজন বুঝিয়া অক্ষরগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়; যেমন—

তোহে জনমি পুন | তোহে সমাওত (৮।৮)
সাগরলহরী স-মানা॥ (৮।৪)

এই ভাষাও বাংলা ভাষা নয়, তবু বাংলার সামিল হইয়া গিয়াছে। এখানে তিনটি পদ লইয়া ঐ একটি পুরাণ; পদগুলির মাত্রা-পরিমাণ পর পর এইরূপ দাঁড়ায়—৮+৮+১২; কারণ, প্রত্যেক অক্ষর—এক মাত্রা, এবং যেগুলির উপরে চিহ্ন দেওয়া আছে—সেগুলি ডবল মাত্রায় অক্ষর। এইবার গণিয়া দেখ, ঠিক ঐ হিসাব মিলিবে। আর একটি ঐ ছন্দ—ভাষাও বাংলা—

যুগ যুগ | বাহী॥ প্রবাহ | তোমারি
দেখলি | কতশত | ঘটনা (৩)

কিংবা—

রে সতী | রে সতী ॥ কাঁদিল | পশুপতি
পাগল | শিব প্রম | থেশ ॥

এখানেও পর্ব্বের মতো ভাগ পাওয়া যাইতেছে—প্রত্যেক পর্ব্বের চারিটি মাত্রা আছে। রবীন্দ্রনাথের—

জনগণ-মন অধিনায়ক ভারত-ভাগ্য-বিধাতা

—এইরূপ মাত্রা-ছন্দের কবিতা।

আধুনিক যুগে ইংরাজীর অনুকরণে বাংলা কবিতার ছন্দ-রচনায় একটি নূতন ভঙ্গি দেখা দিয়াছে। চার বা চারের অধিক—সমান বা অসমান—চরণ লইয়া, যে একটি পৃথক ভাগে ছন্দ রচনা করা হয় তাহাকে ইংরাজীতে stanza বলে—বাংলায় স্তবক নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ছন্দে সময়ে সময়ে পদগুলিকে চরণের মতো করিয়া সাজানো হয়। চরণগুলি, সমান হউক বা ছোট-বড় হউক, সাজাইবার নানা রীতি আছে—এই রীতিও মিলগুলির উপরে নির্ভর করে। উপরে যে তিন রকম ছন্দের কথা বলিয়াছি, ওই তিন ছন্দেই স্তবক রচনা করা যায়। একটি উদাহরণ দিলেই স্তবকের আকার ও প্রকার বুঝিতে পারা যাইবে—

হা-হা করে হাওয়া, দীপ নিবে যায়, সাথীহীন অমারাতি,
বাহিরে বিজনে হায়, হানায় জ্বলিছে জোনাকি-পাঁতি।
সে মহাশূন্য ভরি উঠে মোর নিরাশার উল্লাসে,
কেঁদে উঠি কলহাসে!
আঁধার নয়নে চমকিয়া ওঠে মেরু-দামিনীর ভাতি!

ইহাতে পর্ব্বভাগ-ছন্দের পাঁচটি পঙ্‌ক্তি বা চরণ আছে, চতুর্থ চরণটি ছোট, বাকিগুলি সমান। ১ম, ২য় ও ৫ম চরণে এক মিল আছে; ৩য় ও ৪র্থ চরণে আর এক মিল আছে। মিল অনুসারে চরণগুলি এইরূপ সাজানো আছে—ক ক খ খ ক। মিলের এই গাঁথুনি বড় স্তবকে আরও

কৌশলপূর্ণ হয়, তাহাতে স্তবকের গৌরব বাড়ে। এইরূপ স্তবক রচনা কেবল ছন্দেরই একটা কৌশল নয়—কবিতার ভিতরকার ভাবটিকে যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায় বা পাপড়িতে পাপড়িতে খুলিয়া ধরিবার জন্য কবিরা স্তবক-ছন্দে কবিতা রচনা করেন। অনেক কবিতারই স্তবক ভাল হয় না; অর্থের দিক দিয়া কবিতাটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় মাত্র—গদ্যের যেমন প্যারাগ্রাফ; কিন্তু চরণগুলি প্রায়ই একই রকম এবং মিলের কোন গাঁথুনি নাই। ইহা ছাড়া, ইংরাজী হইতে আরও যে দুইটি ছন্দ-রূপ বাংলা কবিতায় আসিয়াছে সেই **অমিত্রাক্ষর** ছন্দ ও **সনেট**-এর পরিচয় পরে যথাস্থানে দিয়াছি।

কবিতার ছন্দের সঙ্গে, মিলের সম্বন্ধেও কিছু জানিয়া রাখা উচিত। প্রাচীন ভাষাগুলির (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন) ছন্দে মিল নাই। আধুনিক ভাষাগুলির ধ্বনি-প্রকৃতি অন্যরূপ বলিয়া ছন্দে মিল না থাকিলে শুনিতে ভাল হয় না। ফার্‌সি ভাষার ছন্দে মিলের খেলা সবচেয়ে বেশী। দুইটি শব্দের ধ্বনি যদি প্রায় সমান হয়, তবেই তাহাদিগকে স-মিল শব্দ (rhyming words) বলে। ছন্দে মিল করিতে হইলে দুই বা ততোধিক চরণের শেষ শব্দ স-মিল হওয়া চাই। কিন্তু মিল ভাল হইতে হইলে শব্দের কেবল শেষ অক্ষরের ধ্বনি সমান হইলেই চলিবে না, যেমন—চলে+ফেলে; দাহে+স্নেহে; আলোকে+সম্মুখে; বালক+আলোক। ভাল মিল হইবে এইরূপ—চলে+বলে; দেহে+স্নেহে; আলোক+ভূলোক; বালক+পালক। অর্থাৎ কেবল শেষের অক্ষরটির (syllable) মিল নয়—তাহার পূর্ব্ব অক্ষরের অন্ততঃ স্বরবর্ণটিরও মিল চাই, যেমন এইগুলিতে হইয়াছে—চলে+বলে (অলে+অলে); দেহে+স্নেহে (এহে+এহে); আলোকে+ভূলোকে (লোকে+লোকে); [এখানে শুধু স্বরবর্ণ নয়—আগের ব্যঞ্জনবর্ণটিরও (ল-এর) মিল রহিয়াছে] বালক+পালক—আরও ভাল মিল, কারণ এখানে প্রায় তিনটি বর্ণেরই মিল রহিয়াছে (আলক+আলক), এইরূপ মিল গীতি-কবিতার পক্ষে বড়ই উপযোগী। কবিরা অনেক সময় মিল লইয়া একটু খেলাও করেন —চরণের শেষে মিলযুক্ত দুই তিনটি শব্দও বসাইয়া দেন, ইহাকে ইংরাজীতে double ryhme, triple rhyme বলা যায়। যেমন—

গুটি গুটি আসে বৈয়াকরণ। (বৈয়া+করণ)
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ॥ (লৈয়া+চরণ)

মিলের বেশী বাড়াবাড়িও ভাল নয় ; তাহাতে কথার খেলা বা শব্দালঙ্কার কবিত্বকে ছাড়াইয়া যায় যেমন—'শেফালিকা-তলে+কে বালিকা চলে', এখানে ভাব বা অর্থ অপেক্ষা মিলের সৌন্দর্য্য বেশী।

॥ কবিতা পাঠ ॥

'কাব্য-মঞ্জুষা' পড়িবার সময় আমি তোমাদিগকে সেইটুকুমাত্র সাহায্য করিব যেটুকু বুদ্ধিমানের পক্ষেও আবশ্যক হইতে পারে। প্রত্যেক কবিতার বিষয়, এবং তাহার ভাব ও ভাষার একটু পরিচয় দিব—তাহাতে তোমরা কবিতার মধ্যে যে-সকল অপ্রচলিত শব্দ আছে—যে সকল শব্দ কেবল কবিতাতেই ব্যবহৃত হয়, অথবা যে-শব্দ সকল সমাজে প্রচলিত নাই—অর্থসহ তাহাদের একটি তালিকা (Glossary) পুস্তকের শেষে দেখিতে পাইবে। ভাল ভাল কথা, সুন্দর ও অর্থপূর্ণ লাইনও আমি দেখাইয়া দিয়াছি। যেখানে কোন কারণে ভুল হইতে পারে, বা একটু বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, কিংবা, যেখানে কোন একটি শব্দের ব্যবহার ভাল করিয়া লক্ষ্য করা উচিত—সেই সকল স্থানে আমার সাহায্য পাইবে। কিন্তু যেখানে নিজের চেষ্টায়, অভিধান প্রভৃতির সাহায্যে অর্থ বুঝা যায়, সেখানে আমি কিছুই করিব না; কারণ আমি অলস ছাত্রের জন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা-পুস্তক লিখিতেছি না। আর এক কথা। রামায়ণ ও মহাভারতের কোন ঘটনা যদি কোন কবিতার বিষয় হইয়া থাকে, সেখানে সেই কাহিনী বিবৃত করাও আমার কাজ নয়—সে-সকল কাহিনীও তোমাদের জানা থাকা উচিত। যদি না থাকে, তবে সুবল মিত্রের অভিধান দেখিবে। এ বিষয়ে আমার পরামর্শ এই যে, বাংলা সাহিত্যে—গদ্যে ও পদ্যে—রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া এত অধিক রচনা দেখা যায়, অথবা, ঐ দুই পুরাণের বা চরিত্রের উদ্দেশনা (allusion) এত রকমের করা হইয়া থাকে যে তোমাদের পক্ষে অন্ততঃ কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এই দুইখানি গ্রন্থের গল্প জানিয়া রাখা ভাল। যে-সকল কবিতা আবৃত্তি করিবার উপযোগী অথবা মুখস্থ করিলে ভাল হয়, তাহাদের নামের পাশে (*) এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি।

এই কবিতা পাঠের সঙ্গেই আর একটি শিক্ষার সুযোগ করিয়া লইবে—বাংলা ভাষার বাক্য-রচনা ও শব্দ-যোজনার যে বিশেষ ভঙ্গিগুলি আছে তাহা ভাল করিয়া চিনিয়া লইবে। তোমরা অনেকে জান না প্রত্যেক ভাষার একটা নিজস্ব স্বভাব আছে। সেই স্বভাবের জন্য, কেবল অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহায্যে বাক্যের অর্থ ও গঠন ঠিক করিয়া লইতে পারিলেই কোন ভাষাকে আয়ত্ত করা যায় না। যিনি ভাষার সেই বিশেষ ভঙ্গি, রীতি বা

বুলির কায়দা উত্তমরূপে অবগত হইয়া তাহা অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি সাধু-ভাষার উৎকৃষ্ট লেখক হইতে পারিবেন। ইংরাজী ভাষা যে কারণে একটি উৎকৃষ্ট ভাষা, আমাদের বাংলাও সেই কারণে সকল শ্রেষ্ঠ ভাষার সমতুল্য, কারণ বাংলাতেও ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার নানা সূক্ষ্ম কৌশল আছে; ইহাতে যেমন অজস্র বাঁধা-বুলি, বচন ও নানা জাতের শব্দ আছে, তেমনই প্রয়োগের বহুতর কৌশলও আছে। তোমরা এই কবিতা পাঠের প্রসঙ্গেই এইরূপ অনেক ভঙ্গির পরিচয় পাইবে। তাহাদের মধ্যে আমি দুইটি প্রধান ভঙ্গির কথা এই-খানেই বলিয়া রাখিতেছি। একটিকে 'চল্‌তি-বুলি' বা 'ইডিয়ম' বলিয়া জানিবে; সেগুলিতে অভিধান ব্যাকরণের কোন নিয়ম নাই, যথা—'কালাপেড়ে' (কাপড়),—'কালোপেড়ে' নয়; ইহাকে ইংরাজীতে usage বলে; কিংবা যেমন, 'মামার বাড়ী'—'মামা বাড়ী' নয়। তেমনই, কত রকমের যে চল্‌তি রীতি আছে হিসাব করা শক্ত। 'দয়ার শরীর', 'মাটির মানুষ', 'মুখের কথা' যেমন এক ধরণের বুলি, তেমনি, 'মুখ-চোরা', 'ভয়-তরাসে', 'দুধে-ধোয়া', 'মন-মরা' প্রভৃতি কত রকমের যে বাক্‌ভঙ্গি আছে, তাহা তোমরা বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য বা পদ্য-রচনা মনোযোগ দিয়া পড়িলেই দেখিতে পাইবে, আজকালকার বাজে লেখকদের লেখা পড়িলে কিন্তু তাহা পাইবে না; কারণ তাঁহারা প্রায়ই খাঁটি বাংলা ভাষা লিখিতে জানেন না। ভাষার সম্বন্ধে আর একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাকে ইংরাজীতে বলে শব্দের 'phrasal meaning' অর্থাৎ কোন একটি অপর শব্দের সহযোগে (phrase বা খণ্ডবাক্যের মধ্যে) কোন কোন শব্দের যে বিশেষ অর্থ হয়। সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের শব্দগুলিতেই এইরূপ দেখা যায়। ইহার যথেষ্ট উদাহরণ তোমরা 'কবিতা পাঠে'র মধ্যে পাইবে; একটি উদাহরণ এখানে দিতেছি। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ, 'ধরা' ক্রিয়াপদটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, যথা—'বৃষ্টি ধরিয়াছে', 'উনুন ধরাও' ইত্যাদি। ইহাকেই 'phrasal meaning' বলে, আমি উহাকে বাংলায় 'যৌগিক অর্থ' বলিব। কবিতা-পাঠের সময় তোমরা মাতৃভাষার এই গুণগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। আমি হয়ত সর্ব্বত্র দৃষ্টি দিতে পারি নাই, তোমরা আরও অনেক এইরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।



॥ পুরাতন যুগ ॥

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই বাংলা কবিতার রীতিমত আরম্ভ ধরা যাইতে পারে; কারণ তাহার পূর্ব্বে যাহা রচিত হইয়াছিল তাহা কাব্য হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমভক্তিমূলক কবিতা এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণই প্রাচীনতম। তাপর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্মের প্লাবনে বাঙ্গালী জাতির এক নব জাগরণ ঘটে, তাহাতে বাংলা ভাষায় বিশেষ বেগ সঞ্চার হয়; শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ও জীবন-সংক্রান্ত বহু কাব্য, গান ও তত্ত্ব-আলোচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। এ যুগে বাংলা কবিতাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—(১) গান, (২) কাহিনী। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতি-কবিতার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে, কিন্তু কাহিনী-কাব্যের ধারা পুষ্ট হইয়া উঠিলেও সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহার সমধিক বিকাশ হয়, কারণ এই কালেই 'মঙ্গলকাব্য' নামক—গ্রাম্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন-মূলক—একজাতীয় কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রাচীনতম—বিজয়গুপ্তের (খ্রীঃ ১৫ শঃ) 'মনসামঙ্গল' কাব্যের উপাখ্যানে কল্পনা ও কবিত্বের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। তথাপি কাব্য হিসাবে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; অপরাপর মঙ্গলকাব্যগুলি লোক-সাহিত্যের অর্থাৎ, গ্রাম্য গীতি-কথা বা পালা-গানের পর্য্যায়ভুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে আর এক কবি কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ করিয়া, অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন; কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত এই মহাভারতও বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য হইয়া আছে। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য একই ধারায় চলিয়া আসিলেও—কবিতার ভাষা ও রচনার রীতি কিছু মার্জ্জিত হইয়া উঠিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইখানি কাব্য উল্লেখযোগ্য—একখানি ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', অপরখানি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'ই কাব্য-হিসাবে, পুরাতন ধারার শেষ ও চূড়ান্ত নিদর্শন—ভাব ও অর্থের সহিত ভাষার নিপুণ যোজনায়, ছন্দে ও রসসৃষ্টিতেই তিনিই পুরাতন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়—ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হয়—তাহাতে বাংলা কাব্যের ধারা কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সাহিত্যের আদর্শ ও মার্জ্জিত রচনা-রীতি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। এখন হইতে ঊনবিংশ

শতাব্দীর অর্দ্ধেকেরও অধিককাল ধরিয়া, যে ধরণের কাব্যের প্রচলন হইয়াছিল তাহা প্রায়ই, পাঠ করিবার জন্য নয়—গাহিয়া শোনাইবার জন্য রচিত হইত; এই সকল কবিতার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহাও আছে তাহা ঠিক কবিতা নয়—গান; এই কালের, এবং খাঁটি পুরাতন ধারার—শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: ইঁহার ব্যঙ্গ-কবিতা ও রঙ্গরসের রচনাই অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। বাংলা কাব্যের পুরাতন যুগের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তোমরা এই কালের কবিদের নাম, কাব্যের নাম ও তাঁহাদের রচনা-কাল মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে।

পুস্তকের এই ভাগে গান খুব কম আছে, কাহিনী-কবিতাও—রামায়ণ ও মহাভারত হইতেই বেশীর ভাগ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে তোমরা এই কয়জন বড় কবির নাম পাইবে;—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, জ্ঞানদাস, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে আর একজন খুব বড় কবি আছেন, তাঁহার নাম গোবিন্দদাস। প্রায় চারিশত বৎসরের বাংলা কবিতার যে বিবরণ দিয়াছি তাহার সম্পর্কে এই কয়টি মাত্র উল্লেখযোগ্য কবির নাম পাইলে; ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে—প্রাচীন বাংলার উৎকৃষ্ট কাব্য পরিমাণে বেশী ছিল না; এখানে-ওখানে দুই-একজন শিক্ষিত কবি সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ইহার কারণ, সেকালে শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করিতেন না—সর্ব্ববিষয়ে সংস্কৃত ছিল তাঁহাদের আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে, গীতি-কবিতা, চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য (মুকুন্দরাম) ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ছাড়া এ যুগে সাহিত্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য আর কিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পদ-গুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ও বাঙ্গালীর গৌরব—বাঙ্গালী যে গানের রাজা, তাহার প্রমাণ এত পূর্ব্বকালেও এইগুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবে যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য দুইখানিই ভাষায় ও আদর্শে গ্রাম্য গাথা গীতিকা হইতে শ্রেষ্ঠ—এই দুইখানি কাব্য বাংলা ভাষাকে বহুদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। উভয় কবির কাব্যে (বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের), সেকালের সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের জীবনযাত্রা ও প্রাণমনের যেটুকু প্রকর্ষের (culture) পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে এই দুই কাব্য আজও বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হইয়া আছে; আরও মূল্যবান এইজন্য যে—ইহারা সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের কেবল অনুবাদই নয়, সেই দুই মহাকাব্যের কাহিনীকে ও তাহার

অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে, এই দুই কবিই বাঙ্গালীর অন্তরের আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন; এই জন্য এই দুই কাব্য প্রকৃতই বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই পুস্তকে উদ্ধৃত কবিতাগুলিতেও দেখিবে কাহিনীর বিষয় এবং পাত্র-পাত্রী সকলেই সেই সংস্কৃত মহাকাব্যেরই বটে, কিন্তু তাহা একেবারে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে—পাত্র-পাত্রীও খাঁটি বাঙ্গালী। অতএব এ যুগের উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা যেমন বৈষ্ণব পদাবলী, তেমনই এই দুইখানিই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-কাব্য। খাঁটি সাহিত্যের দিক দিয়া বাকি থাকে আর দুইখানি—'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল'। চণ্ডীমঙ্গলের কবিত্ব বা কল্পনা সেকালের পক্ষে প্রশংসনীয় বটে, তথাপি তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপযুক্ত নয়—অদ্ভুত ও অসম্ভব রূপকথার মিশ্রণ তাহাতে আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুকুন্দরাম বাস্তব-বর্ণনায় ও চরিত্র-সৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম সত্যকার কবিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষার বাংলা শব্দসম্পদ্ বিস্ময়কর। এজন্য তিনি এক হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের একজন বড় কবি। ভারতচন্দ্রের কবিতার যে নমুনা দিয়াছি তাহাতে দেখিবে—এই কবি রচনা-নৈপুণ্যে ও উৎকৃষ্ট ভাষার গুণে, এ যুগের কাহিনী-কাব্যকে একটি উচ্চ সাহিত্যিক আদর্শে তুলিয়া ধরিয়াছেন; কিন্তু ভারতচন্দ্র আধুনিক কালের বড় নিকটবর্ত্তী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও জীবন-সংক্রান্ত পদ্য গ্রন্থগুলি ঠিক কাব্য জাতীয় নয়, যদিও তাহার অনেক স্থলে ভাবের ও বর্ণনার কবিত্ব আছে—এগুলিকে সে যুগের পদ্য-রচিত গদ্য-সাহিত্য বলা যাইতে পারে; তথাপি ইহাদের দ্বারা একটি কাজ হইয়াছিল—বাংলা ভাষার চর্চ্চা বাড়িয়াছিল, ভাষারও উন্নতি হইয়াছিল। এ যুগে অনেক পল্লী-গান ও গীতিকা রচিত হইয়াছিল—তাহাদের ভাবে যথেষ্ট কবিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ভাষায়, কল্পনায় বা রচনা-রীতিতে সাহিত্যিক লক্ষণ নাই, অতএব সেগুলি পৃথক বস্তু—একথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—'মৈমনসিংহ-গীতিকা'।

॥ কবিতা পাঠ ॥

(১)

কবিতাটি প্রাচীন মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটি পদ ; ইহার ভাষাও মৈথিল ভাষা। মূল মৈথিল ভাষার কবিতা এককালে বাঙ্গালীর প্রায় নিজস্ব হইয়া উঠিয়াছিল। এই কবিতাটিতে ভগবানের নিকট ভক্তের আত্মসমর্পণের ভাবটি কেমন গভীর ও প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—মাত্রা-ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)। পদভাগ এইরূপ—

গণইতে । দোষ গুণ ॥ —লেশ নাহি— ।'পায়বি । (৪।৪॥৪।৪)

যব তুহুঁ । করবি বি । চার— (৪।৪।৩)

২-৩। দেবতাকে কোন দ্রব্য সমর্পণ করিবার সময়ে তাহার উপরে তিল ও তুলসী রাখিতে হয়। ইহার দ্বারা ভক্ত আপনার মনের গভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তিনি যেন সারা মনঃপ্রাণ দিয়া দেবতাকে সেই দ্রব্য উৎসর্গ করিতেছেন। **জনু**—যেন না। আমার প্রতি যেন তোমার দয়া থাকে।

৬-৭। তোমাকে জগৎজন জগতের নাথ, অর্থাৎ প্রভু ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া থাকে ; এই অধম আমি ত' জগতের বাহিরে নই। **কহায়সি**—কথিত হও। ১০। কর্ম্মবিপাকে, অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হইয়া যে-জীব হইয়াই জন্মলাভ করি না কেন, তোমার প্রসঙ্গে যেন আমার ভক্তি থাকে। ইহাই ঐকান্তিক ভক্তি। **কিয়ে**—কিবা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **করম-বিপাকে (কর্ম্মবিপাকে) ; গতাগতি ; ভণয়ে ; ভবসিন্ধু ; পদ-বল্লব।**

(২)

এই কবিতাটিও মৈথিল ভাষায় রচিত। কবিতার ভাবার্থ হরি বা ভগবানের মত প্রেমিক প্রিয়জন আর কে আছে ? গভীর বর্ষারাত্রে একাকী গৃহে বিনিদ্র অবস্থায় প্রাণ তাঁহার কাতর হইয়া উঠে। এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির মতে বর্ষাকালেই মানুষের প্রিয়জনের সহিত মিলনের জন্য অতিশয়

উৎকণ্ঠিত হয়; এখানেও কবি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। প্রিয়জনের জন্য যে বিরহ ভগবৎ বিরহকেও তাহার তুল্য করিয়া বৈষ্ণব ভক্ত সাধকেরা ভগবানকে অতি নিকট প্রিয়জনরূপে অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন। (অপ্রচলিত শব্দের জন্য 'শব্দার্থসূচী' দেখ)।

ছন্দ—অসম মাত্রা ছন্দ, চার ও তিন মাত্রায় পদভাগ, এজন্য সাত ও আট মাত্রায় যেমন, তেমনই ৫।৭ মাত্রায়ও পদভাগ আছে।

সখি হে হমর | দুখক নাহি ওর (৭+৮)

ঝাম্পি ঘন গর | জন্তি সন্ততি (৭+৮)

ভুবন ভরি বর | সন্তিয়া (৭+৫)

কুলিশ কত শত | পাত মোদিত (৭+৭)

ময়ূর নাচত মাতিয়া (৭+৫)

—পদভাগ প্রধানতঃ এইরূপ। এই কবিতার শব্দ ঝঙ্কার অপূর্ব্ব। প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ৪। **ঝাম্পি**—ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঝম-ঝম শব্দ করিয়া। অথবা ঝাঁপিয়া—দশ দিক আবৃত্ত করিয়া। সন্ততি—চতুর্দ্দিকে। ৬। **পাহুন**—পাষাণ, নির্ম্মম। ৭। **খরশর হন্তিয়া**—খরশরের দ্বারা হনন করিতেছে। ৮। **মোদিত**—মেঘের ডাকে (বজ্রনাদে) ময়ুর 'মোদিত' অর্থাৎ উৎফুল্ল হয়। —১৩। **পাঁতিয়া**—পাঁতি বা পঙ্‌ক্তি। বিদ্যুতের (বিজুরীক) পঙ্‌ক্তি যেন লাইন-টানা; ভাষা বড় সুন্দর হইয়াছে। ১৪। **গমাওব**—যাপন করিব।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা—**কান্ত; কুলিশ; মোদিত; দাদুরি; বিজুরি।**

(৩)

এই কবিতাটিও মৈথিল ভাষায় রচিত। শেষে ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষের আর কোন গতি নাই—এই ভাবটি এই কবিতায় বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। সব কয়টি লাইনই মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—মাত্রা-ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ')।

১। **পরিনাম-নিরাশা**—পরিণাম সম্বন্ধে নিরাশা (বিশেষণ)। ৩। অতএব তোমারি উপরে একমাত্র নির্ভর। ৪-১। এই পঙ্‌ক্তিগুলি প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে। অর্থ—পরপর কত সৃষ্টি, কত প্রলয় বহিয়া গেল, কত চতুরানন (ব্রহ্মা

—সৃষ্টিকর্ত্তা) সৃষ্টির সহিত সম্বর্দ্ধন করিল তোমার আদিও না'ই অবসানও নই ; সমুদ্রে লহরীর মত সকলই তোমাতে উঠিয়া তোমাতেই মিলিয়া যায়। **সমাওত**—বিলীন হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **সাগরলহরী সমানা ; শমন ভয়।**

(৪)

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতায় সেকালের বাঙ্গালী সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান কেমন ছিল, ধনীদিগের গৃহেও বেশভূষা ও বিলাসের আয়োজন-উপকরণ কত সামান্য ছিল, তাহার কিছু পরিচয় পাইবে। কৃত্তিবাস রামায়ণকে শুধু ভাষাতেই নয়, সকল বিষয়েই বাংলা করিয়া তুলিয়াছেন।

ছন্দ—পুরাতন পয়ার।

২-৩। সেকালের একটি সুন্দর বৈবাহিক শিষ্টাচার। ৭। কেশসংস্কারের জন্য আমলকী-চূর্ণের ব্যবহার—সেকালের অতি সহজ ও স্বল্প-তুষ্ট জীবনযাত্রার একটি সুন্দর নিদর্শন। ১৪। **পাটের**—রেশমী সুতার (আজকাল যাহাকে 'পাট' বলে তাহা নয়), সংস্কৃত 'পট্টবস্ত্রে'র 'পাট'। ১৫। **ঝিলিমিলি**—'শব্দার্থ-সূচী' দেখ। ২২। **বাজন-নূপুর**—বাজে এমন নূপুর। নূপুরের সঙ্গে 'বাজন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য কর। ২৪। **সোহাগের বাতি**—এখানে, 'সোহাগ—সৌভাগ্য ; সৌভাগ্যসূচক প্রদীপ। ৩১। এই 'জলধারা' দেওয়ার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ৩৪। পাণিগ্রহণ। ৩৮। 'রোহিণী' 'চিত্রা' প্রভৃতি নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণিত। ৪০। **পরিহার করে**—এখানে 'দান করে'। দানের সহিত দক্ষিণা দিতে হয় ; এখানে কন্যাদানের দক্ষিণা হইল পাঁচটি হরিতকী মাত্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **ঝিলিমিলি ; তোলা জল ; পূর্ব্বাপর ; বিলক্ষণ, বাসরঘর।**

(৫)

বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা কবি চণ্ডীদাসের পদ। শ্যামের রূপবর্ণনাই কবিতাটির বিষয়। উপমাগুলি দেখ। এইরূপ উপমা প্রাচীন কবিতার একটি বিশেষত্ব।

ছন্দ—পুরাতন ত্রিপদী, অর্থাৎ পদভাগের ছন্দ। গানের পদ বলিয়া অক্ষর-সংখ্যা ঠিক নাই; সাধারণতঃ—৮+৮+১২।

৪-৫। "**থেহা**' অর্থে, (এখানে) ঘন-রস। সেই 'থেহা' আবার নিংড়াইয়া আরও যে সারবস্তু পাওয়া যায় তাহা দ্বারা শ্যামের মুখ গড়িয়াছে।

১৩। **বিস্তারি পাষাণে, ইঃ**—বক্ষ যেমন প্রশস্ত, তেমনিই নিটোল ও মসৃণ যেন একখানি পাষাণ-ফলক, গলার রত্নহার সেই পাষাণে খচিত মণিশ্রেণীর মত দেখাইতেছে।

১৭-১৮। **'আদলী'**—উরুমূল হইতে কটি পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহাকে আদলী বা অর্দ্ধস্থালীর (হাঁড়ি বা কলসের নিম্নাংশ) সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার উপর কদলীসদৃশ উরু দুইটি রোপিত বা স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন কবিতায় উরুর সঙ্গে কদলী-বৃক্ষের যে তুলনা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহার গোড়াটি উপরের দিকে এবং মাথাটি নীচের দিকে ভাবিয়া লইতে হয়। বলা বাহুল্য, এ সকল উপমায় ঠিক বাহিরের সাদৃশ্য ততটা নাই, যতটা আছে ভাবের সাদৃশ্য।

১৯। **দর্পণ**—নখের উপমা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **সুধা ছানিয়া; গঞ্জিয়া; কম্বু; দাম; স্তবম করেছে।**

(৬)

এই কবিতাটি বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ। প্রথম চার লাইন মুখস্থ করিবে। কবিতাটি খাঁটি বাংলা হইলেও ইহাতে 'ব্রজবুলি'র ছাপ আছে। মৈথিল কবিতার অনুকরণে বাঙ্গালী কবিরা যে ভাষায় কবিতা লিখিতেন তাহার নাম 'ব্রজবুলি'। এইরূপ হইবার কারণ এক কালে বহু বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইতেন। সেখান হইতে তাঁহারা মৈথিল কবিতা শিখিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; এই ভাষার কবিতা বাঙ্গালীদের বড় ভাল লাগিত।

এই 'আক্ষেপ'—রাধার আক্ষেপ। কৃষ্ণকে পাইবার আশা করিয়া রাধা বড় ভুল করিয়াছে।

ছন্দ—ত্রিপদী (৬+৬+৮) পদভাগের ছন্দ।

৫। **করমে লেখি**—অদৃষ্টের ফল; ভাগ্যে লিখা ছিল। ১২-১৫। সাগর সেঁচিলে মাণিক পাওয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ আছে। নগরে বহু ধনীর

সমাগম হয়—বণিক শ্রেষ্ঠীরাও আসিয়া বাস করে; অতএব নগরেই বহুমূল্য মাণিকের সন্ধান মিলিতে পারে। ১৮-১৯। কবি বলিতেছেন, কৃষ্ণকে (ভগবানকে) ভালবাসা ত' সহজ নয়। সে ভালবাসার আগুনে সারা দেহ (দেহের সুখ) দগ্ধ হইয়া যায়; তাই তাহা যত প্রবল, ওই জ্বালাও তত অধিক হইবায় কথা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: (ঘর) **বাঁধি**; (নগর) **বসানু**; (জলদ) **সেবিনু**।

(৭)

'কালকেতু' কবিকঙ্কণের কাব্যের নায়ক। কবিকঙ্কণ ব্যাধপুত্রকে অর্থাৎ অতিশয় নিম্নজাতীয় একজনকে তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়া তাহার চেহারা ও বলবীর্য্যের বর্ণনায় কেমন সত্যকার বীরমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহার একটি কারণ, এই গল্প তাঁহার নিজের নয়—বাংলার প্রাচীন পল্লীগাথা অবলম্বনে রচিত। তথাপি কবির কল্পনা যে এইরূপ নায়ককে অবহেলা করে নাই, ইহাতে মানুষ হিসাবেই যে মহত্ত্ব তাহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। (অপ্রচলিত শব্দের অর্থ পুস্তকের পরিশিষ্টে দেখ।)

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

২৪। **শশারু**—খরগোশের পুরানো বাংলা নাম।

(৮)

এই কবিতাটি কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে। দাম্ভিক ক্ষত্রিয়বীর এবং রাজাগণ যাহা পারিলেন না, একজন দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণযুবা তাহা পারিল; একদিকে রাজাগণের নিরাশ হওয়ার জন্য ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং অপর দিকে সত্যনিষ্ঠ, বিনয়ী, নিরভিমান ব্রাহ্মণবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের ব্যবহার—ইহাই এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা বড় সত্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহা এই যে,—নীরব সাধনা, চরিত্রবল ও পুরুষকার, এই তিনের দ্বারাই মানুষ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জয় করিয়া লইতে পারে। সেজন্য বংশগৌরব বা প্রবল আত্মীয় বন্ধুর সাহায্যের আবশ্যক হয় না।

ছন্দ—পয়ার।

১৫। **পুষ্পবৃষ্টি** অর্থে, 'অতিশয় মৃদু বৃষ্টি'ও হয়। ২১। **হতচিত্ত**—হতাশ; ক্ষুব্ধহৃদয়। ২৭। **চিত্তে উপরোধ করি**—মনের ভাব দমন করি;

আত্মসংযম করি। ২৮। **উচিত**—উচিত শাস্তি। ৪৫-৪৬। এই লাইন দুইটি মুখস্থ রাখিবে। ৪৯। **ভণ্ডন**—ভাঁড়ানো; গোপন করা। ৫৮। **আখণ্ডল**—ইন্দ্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **বল্লভ; দ্রুপদের বালা; শিষ্ট-দুষ্ট; আকর্ণ-পূরিয়া।**

(৯)

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' হইতে গৃহীত। পিত্রালয়ে, পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাই শিব অনুচরবর্গসহ দক্ষালয়ে চলিয়াছেন। মহাদেবের মূর্ত্তি ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে। জটায় গঙ্গা, গলায় সর্প, ললাটে শশিকলা এবং তৃতীয় নেত্রে অগ্নি—সকলই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছেন।

ছন্দ—সংস্কৃত 'ভুজঙ্গপ্রয়াত'; বাংলা ছন্দ নয়। ইহা মাত্রা-ছন্দ ('কবিতার ছন্দ' দেখ)। মাত্রাসংখ্যা—২০। এইরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর করিয়া পড়িবে—

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে

—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, এবং দীর্ঘস্বর (ঊ, এ, আ, ঈ) দীর্ঘ ধরিতে হইবে।

৩। **সংঘট্ট**—(বিণ) সংঘটিত, অর্থাৎ সংঘাতে আন্দোলিত। ৪-৫। এই দুই পঙ্‌ক্তিতে শব্দের কেবল ধ্বনির দ্বারাই ভাবপ্রকাশ করিবার কৌশল লক্ষ্য কর। **গাজে**—গর্জ্জন করে। ৬। নিশানাথ চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপযুক্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ চন্দ্রও সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে।

(১০)

এইটিও 'অন্নদামঙ্গলে'র কবিতা—ভারতচন্দ্রের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রটি কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া দেখিবে; এই চরিত্রই এই কবিতার প্রধান বিষয়।

ছন্দ—পয়ার।

১২। **বিশেষণে**—অর্থাৎ নাম না করিয়া, গুণের বর্ণনা দ্বারা। ১৩-১৬। এখানে 'গোত্র', 'পিতামহ', 'বাম', 'সিদ্ধি', 'গুণ', 'কু-কথা', 'দ্বন্দ্ব', 'ভূত' প্রভৃতি শব্দগুলির দুইটি অর্থ আছে। তাহা ছাড়া—'অতি বড় বৃদ্ধ', 'কপালে আগুন', 'পঞ্চমুখ', 'কণ্ঠভরা বিষ', 'শিরোমণি', 'যে মোরে আপন ভাবে' ইত্যাদি—এ

সকলের শ্লেষ অর্থ লক্ষ্য করিবে। সব মিলিয়া পরিচয় দাঁড়াইবে এই :—আমি হিমালয়কন্যা—উমা বা দুর্গা; মহাদেব আমার স্বামী; গঙ্গা আমার সপত্নী, এবং মৈনাক পর্ব্বত আমার ভাই। আমি দেবী, ভক্ত মাত্রেই আমার প্রিয়; যে ভক্তি করে ('আপনা ভাবে') তাহারই গৃহে আমি বিরাজ করি,—অর্থাৎ নিকটে থাকিয়া তাহার মঙ্গল করি।

২১। **সতা**—সতিন; **তরঙ্গ**—(দ্বিতীয় অর্থ) হাবভাব, লাস্য-লীলা। ৪৬। এই লাইনটির অর্থ ভাল হয় না। মূল পুঁথি হইতে নকল করিবার সময় ভুল হইয়া থাকিবে; পরে সেই ভুলই ছাপা হইয়া আসিতেছে। এইরূপ, একটা করা যায় :—তাঁহার ইচ্ছাই এইরূপ সৌভাগ্যের কারণ; নতুন বা কাঠের সেঁউতিতে তপের ফল ফলিতে পারে না। ৫৮। **অষ্টাপদ**—সোনা। ৬৯। ভবানন্দ মজুমদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ। এই কাহিনী দ্বারা কবি তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৭২। এই বাক্যটিতে পাটনীর যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা যেন সেকালের বাঙ্গালীমাত্রেরই শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। 'দুধে ভাতে থাকা'র চেয়ে ভাল অবস্থা আর কি হইতে পারে? [(৬১)—কবিতা দেখ।]

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **কেয়াফার; অহর্নিশ; দ্বন্দ্ব; ভব-পারাবার; কোকনদ; ধেয়ায়; গজ-গমন; অষ্টাপদ।**

(১১)

কবিতাটি গানের মত করিয়া লেখা। উপমাটি বড় সুন্দর, মুখস্থ করিবে। ছন্দ—পদভাগের ছন্দ (৮+৮)। প্রত্যেকটি চরণে তিনটি পদ। শেষ পদটি ৫ অক্ষরের।

৫। **ধারাজল**—বৃষ্টির জল।

(১২)

রামপ্রসাদের একটি বিখ্যাত শ্যামা-সঙ্গীত। এই কবিতাটি গান। রামপ্রসাদের এই গান বাংলা ভাষায় এক অপূর্ব্ব বস্তু—এমন সরল অথচ ভাবগভীর, এত সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ গীতিরচনা বাংলায় খুব কম

আছে। এই কবিতা ভক্তিমূলক হইলেও (ভূমিকা দেখ) ইহাতে গীতি-মাধুর্য্য আছে। এ কবিতার মূলভাব এই:—সত্যকার পূজায় অর্থাৎ ভগবৎ-আরাধনায়, আয়োজন উপকরণের কোন আড়ম্বর আবশ্যক হয় না, তাহাতে বরং আরও অনিষ্ট হয়—মনে দম্ভ বা অহঙ্কার জন্মে। সে পূজায় অন্তরের ধারণাই যথার্থ প্রতিমা; ভক্তিই শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ দীপ; এবং কু-প্রবৃত্তি সকলই যথার্থ বলিদানের বস্তু। ইহাই প্রকৃত নিরাকার উপাসনা। এমন সহজ ভাষায় এমন গভীর কথা কবিতায় আর কেহ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের গানের একটি অতি সহজ সুরও আছে। তাহার নাম হইয়াছে—'রামপ্রসাদী'।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ।

(১৩)

কবিতাটি ইংরেজ কবি পোপের (Alexander Pope) বিখ্যাত 'Universal Prayer'-এর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। মূল কবিতাটির সঙ্গে মিশাইয়া পড়িবে। কবিতাটির ভাষা প্রায় সরল গদ্যের মত; কবিতা হিসাবে রচনা উৎকৃষ্ট নয়; কিন্তু ইহাতে কতকগুলি ভাব ও চিন্তা আছে।

ছন্দ—পয়ারের চতুষ্পদী স্তবক (Stanza)। ইংরাজীর অনুবাদ বলিয়া এই প্রথম আমরা বাংলা কবিতায় 'স্তবক' পাইলাম।

১১-১২। প্রকৃতির আর সকলই (জীবজন্তু, গ্রহ উপগ্রহ) ভাগ্য, অর্থাৎ নিয়তির অধীন; কেবল মানুষকে তুমি বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি দিয়াছ। ইংরাজী কবিতায় আছে—

"Binding Nature fast in fate
Left free the human will."

২৫-২৬। অর্থাৎ, পাপী বলিয়া যেন কাহারও নির্য্যাতন না করি; কারণ, আমার এমন জ্ঞান নাই যে, কোন্ অবস্থায় কোন্ আচরণ পাপ, তাহা নির্ণয় করিতে পারি। ২৭-২৮। অর্থাৎ যাহারা আমার মতে তোমার আরাধনা করে না, তাহাদিগকে তোমার শত্রু মনে করিয়া পীড়ন না করি। এই পঙ্‌ক্তির শব্দ কৌশল লক্ষ্য কর—এইরূপ যমক ও অনুপ্রাস ঈশ্বর গুপ্তের বড় প্রিয় ছিল। ৩৯-৪০—"Lord's Prayer" হইতে এই ভাবটি লওয়া হইয়াছে—"Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass

against us". ৪৬। **রবিতলে** অর্থাৎ পৃথিবীতে; ইংরাজী বাক্‌ভঙ্গী—"under the sun"—কবিতায় চলিতে পারে, গদ্যে অচল। ৪৩-৪৪। যদি বাঁচিতে হয় তোমার ইচ্ছায় যেন বাঁচি; যদি মরিতে হয়, তোমার ইচ্ছায় যেন মরি।

(১৪)

ইহাও একটি খাঁটি ঈশ্বরগুপ্তী কবিতা। শেষ লাইন দুইটির ভাষার ভঙ্গি দেখ।

ছন্দ—পয়ার।

৫। **মন নাহি সরে**—পছন্দ হয় না; এখানে 'সরে' এই ক্রিয়াপদের অর্থ একটু অন্যরূপ, তাহা লক্ষ্য কর। এইরূপ অর্থকেই 'যৌগিক অর্থ' (phrasal meaning) বলে। ঐ শব্দের ঐ অর্থ আর কোথাও হয় না—'প্রাণ সরে' বলিলে কোন অর্থ হয় না। ভাষার এই চল্‌তি রীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

(১৫)

এই কবিতাটি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' উপাখ্যান কাব্যে আছে। রঙ্গলাল পরিবর্তন-যুগের প্রথম, ও পুরাতন যুগের শেষ কবি; তিনি যেন ঠিক সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুই দিকেই দৃষ্টি করিতেছেন। তথাপি পুরাতনের প্রতি তাঁহার মমতা এত অধিক যে, তিনি সেই আদর্শ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

কবিতাটির বিষয়—স্বদেশ-প্রীতি। ইহাই কবিতার নূতনত্ব, প্রাচীন কবিতার কোথাও স্বদেশ-প্রীতির কথা ছিল না। এক সময় ইহার প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তি সকলের মুখস্থ ছিল; তোমরাও মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ (৮+৮+৬), যথা :—

স্বাধীনতা-হীনতায় ॥ কে-বাঁচিতে চায় হে ॥
কে বাঁচিতে চায় ॥

—এখানে 'হে' দুই অক্ষরের সমান।

(১৬)

কয়েকটি চমৎকার নীতিকথা—সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ; সবগুলিই 'নীতি কবিতা'র উৎকৃষ্ট উদাহরণ ('কবিতার কথা' দেখ)। এইরূপ কবিতা সুন্দর হয় দুইটি বস্তুর গুণে—উপমা ও দৃষ্টান্ত।

ছন্দ—ত্রিপদী ও পয়ার।

১১। **গজভুক্ত কথ্‌বেল**—সংস্কৃত "গজভুক্ত কপিত্থবৎ"। গজ অর্থে হস্তী নয়—একপ্রকার ক্ষুদ্র কৃমি। "কপিত্থান্তর্গত গজ ইত্যভিধীয়তে"— বৈজয়ন্তী। **খেল্‌**—বিস্ময়কর আচরণ, যেমন 'ভেল্‌কির খেল'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **কূপ-পয়; সলিল-সম্পাতে; অঙ্কুশ; গরল; শ্রুতির শোভন শ্রুতি।**

(১৭)

রঙ্গলাল পরিবর্ত্তন-যুগের প্রথম এবং পুরাতন যুগের শেষ কবি; তিনি যেন ঠিক সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তথাপি পুরাতনের প্রতি মমতা এত অধিক যে, তিনি সেই আদর্শই রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় ইংরেজী কাব্যের অনুকরণ থাকিলেও প্রাচীন ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির ছাপ এতই স্পষ্ট যে তাঁহাকে পরিবর্ত্তন যুগে না আনিয়া শেষ প্রাচীনপন্থী কবি বলাই সঙ্গত।

এই লাইনগুলি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে আছে। এইগুলির মধ্যে শেক্‌সপীয়ারের কয়েকটি বিখ্যাত লাইনের প্রভাব স্পষ্ট উঁকি দিতেছে। লাইনগুলি এই—

"To guild refined gold, to paint the lily.
To throw a perfume on the violet
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess."

তথাপি কবি ঐ ইংরেজী উপমার ভাষাকে কেমন বাংলা করিয়া লইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

১১। **গজমুক্তা**—নাম হইল কেন?

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **মৃগমদ; কষিত কাঞ্চন; সিন্দুরে মাজা; মুক্তাফল।**

॥ পরিবর্ত্তন-যুগ ॥

এই যুগের যে কবিতাগুলি তোমরা এই পুস্তকে দেখিতে পাইবে, তাহাদের সঙ্গে পূর্ব্বের কবিতাগুলি তুলনা করিলে, এই কয়টি বিষয়ে দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।।

(১) এই যুগের কবিতার ভাষা আরও অধিক সাধু ও সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার কারণ, এখন হইতে উচ্চশিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে ও পাঠ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ব্বে বাংলা ভাষা বিধানের ভাষা ছিল না, সে ভাষায় যে কবিতা রচিত হইত, তাহা প্রায় অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য : তাহাতে তাহাদেরই গ্রাম্য ধারণার উপযোগী ভাব ও কল্পনা প্রকাশ পাইত ; ভাষাও তাহারই উপযুক্ত ছিল। দুই চারিজন পণ্ডিত কবির কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাঁহাদের ভাব কতকটা মার্জ্জিত এবং উন্নত হইলেও কল্পনা অতিশয় সংকীর্ণ ও মামুলী ধরণের ছিল। এক্ষণে, প্রাচীন কাব্য হইতেও যেমন, তেমনি বিদেশী কাব্য হইতেও—উৎকৃষ্ট বিষয়, গভীরতর ভাব ও উচ্চতর কল্পনা আহরণ করিয়া, বাংলা ভাষায় রীতিমত উচ্চাঙ্গের কাব্য-রচনার আগ্রহ—বিশেষ করিয়া, ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিল। এজন্য পূর্ব্বের ভাষায় আর কাজ চলিল না। গ্রাম হইতে শহরে অথবা নদী হইতে সমুদ্রে আসিলে যেমন এক নূতন বস্তুর—নূতন দৃশ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় যে, তাহা বর্ণনা করিতে আগেকার ভাষায় আর কুলায় না, নূতন শব্দ, নূতন বাক্য শিখিয়া বা তৈয়ারী করিয়া লইতে হয় ; তেমনই এই, যুগে প্রাচীন ও আধুনিক, দেশী ও বিদেশী, বিরাট ও কাব্য-সাহিত্যের ভাবসকল আত্মসাৎ করিয়া বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য পুরাতন ভাষাকে অনেক পরিমাণে মার্জ্জিত এবং বহু নূতন শব্দের দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইল। যাঁহারা এই কাজ উত্তমরূপে করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই যুগের প্রধান কবি ও লেখক। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভাষার পশ্চাতে সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় শব্দ-ভাণ্ডার ছিল বলিয়াই আমরা এ কাজ এত শীঘ্র করিতে পারিয়াছিলাম ; আরও কারণ, আমাদের বাঙ্গালী জাতির ভাবুকতা ও কল্পনাশক্তি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী, তাই আর কোন ভারতীয় ভাষায় এমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য এখনও সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

(২) এই যুগের কবিগণের কল্পনা ও মনোভাব কত ভিন্ন, তাহাও লক্ষ্য কর; কবিরা এক্ষণে নিজেদেরই ভাবনা কামনা কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন; মনুষ্যজীবনের সম্বন্ধেও কত চিন্তা এখন কবিতার বিষয় হইয়াছে; প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, শিশুর সৌন্দর্য্য, স্বদেশের গৌরব, স্বজাতির উন্নতি, মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা, দূর-দেশ ও অতীত যুগের সম্বন্ধে কল্পনা—কবিগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে।

(৩) কবিতার ভাষার মত, কবিতার ছন্দও নূতন হইয়া উঠিতেছে; ইহারও পরিচয় এই কবিতাগুলির মধ্যেই তোমরা পাইবে।

এই যুগের চারিজন কবিই প্রধান:—(১) 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত; (২) 'সারদামঙ্গল'-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী; ইঁহার কাব্যে গীতি-কবিতার একটি নূতন ধারা আরম্ভ হইয়াছে, (৩) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি 'বৃত্রসংহার' নামক মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন; তথাপি ইঁহার রচিত 'কবিতাবলী' প্রভৃতি খণ্ডকবিতাগুলিই সর্ব্বত্র পঠিত হইত, এবং তাহার জন্যই ইনি এ-যুগের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিলেন। (৪) আর একজন বড় কবি—নবীনচন্দ্র সেন; ইঁহার রচিত 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'—এই তিনখানি বড় কাব্য সেকালে খুব খ্যাতিলাভ করিলেও তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানিই এই সময়ে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল। এই পরিবর্ত্তন-যুগের কবিতা সম্বন্ধে আর একটি কথা তোমরা জানিয়া রাখিবে,—এ যুগে মহাকাব্যই ছিল কাব্যের আদর্শ, এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত মহাকাব্যগুলি ('মেঘনাদবধ', 'বৃত্রসংহার', 'রৈবতক' প্রভৃতি) ছাড়াও বহু মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সবই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে কেবল ঐ কয়খানি মাত্র বাংলা কাব্যের ইতিহাসে টিকিয়া আছে; এবং তাহাদের মধ্যে কাব্য হিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাবধ কাব্য'ই শ্রেষ্ঠ। এই যুগের আরও অনেক কবির পরিচয় এই পুস্তকে তোমরা পাইবে। তাঁহাদের মধ্যে 'মহিলা কাব্যে'র কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এবং 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রী কামিনী রায়ের নাম বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে।

(১৮)

এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত মহাকাব্য 'মেঘনাদ-বধ' হইতে উদ্ধৃত। ইহার ছন্দ বাংলায় সম্পূর্ণ নূতন—ইহা ইংরাজী Blank Verse-এর অনুকরণে বাংলা **অমিত্রাক্ষর**। এই কবিতার ভাষা এবং ছন্দ খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে। ভাব খুব সহজ—কেবল দুরূহ কথাগুলির অর্থ জানিয়া লইলেই এবং ছন্দ ঠিকমত পড়িতে পারিলেই, এ কবিতা খুব ভাল লাগিবে।

ছন্দ—অমিত্রাক্ষর, অর্থাৎ মিলহীন পয়ার, কিন্তু পয়ারের মত পড়িলে চলিবে না; লাইনের শেষে না থামিয়া যেখানে বাক্য শেষ হইয়াছে সেখানে থামিবে; এবং তাহারও মধ্যে, বাক্যের অংশগুলি অর্থ অনুসারে একটু পৃথক করিয়া পড়িবে—তাহা হইলেই পড়িতে কোন কষ্ট হইবে না। একটু দেখাইয়া দিতেছি –

ছিনু মোরা, সুলোচনে, | গোদাবরী তীরে ।
কপোত কপোতী যথা | —উচ্চ বৃক্ষচূড়ে, |
বাঁধি নীড়,—থাকে সুখে; ॥ ছিনু ঘোর বনে, |
নাম পঞ্চবটী, | —মর্ত্তে সুর-বন-সম ॥

প্রত্যেক লাইনে ৮ ও ৬ অক্ষরের পদভাগ আছে—যেমন পয়ারে থাকে ('বাংলা ছন্দ' দেখ); তাই মাঝে ও শেষে (|) এই চিহ্ন দিয়াছি - ওই দুই জায়গায় খুব সামান্য একটু থামিতে হয়, উহাকে 'যতি' বলে। এখানে প্রথম লাইনের শেষে একটু বেশী থামিতে হইবে, কারণ ওখানে 'কমা' আছে। মাঝে এক জায়গায় আরও বেশী থামিতে হইবে বলিয়া (॥) এইরূপে ডবল চিহ্ন দিয়াছি। যেখানে কথাগুলি পৃথক করিয়া পড়িতে হইবে সেখানে (—) এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। কিন্তু এইসকল চিহ্নের দরকার হয় না; অর্থ বুঝিয়া পড়িলে, থামিবার জায়গাগুলি আপনি ঠিক হইয়া যায়, তখন ছন্দ বুঝিতে কষ্ট হয় না। কেবল যতির স্থানগুলি একটু লক্ষ্য করিবে।

২০। **পীরিতি**—প্রীতি, আনন্দ। ২৩। **মধু**—বসন্তকাল। ৩৬-৩৭। তুলনাটি ঠিক হইয়াছে কিনা দেখ। ৪৭। দেবকন্যারা সূর্য্যরশ্মির রূপ (ছদ্মবেশ) ধরিয়া পদ্মবনে খেলা করিতেন। ৬১-৬৩। নদীর জলে আকাশের প্রতিবিম্ব।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি; বৈতালিক; কান্তার; রাঘব-রমণী।**

(১৯)

গৃহীত : মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' কাব্য হইতে।

ছন্দ—অমিত্রাক্ষর—পূর্ব্বের কবিতা দেখ।

১। **নাথ**—মহাপুরুষ বাচক উপাধি, যেমন ইংরেজী Lord; এখানে রামচন্দ্র। ২৬। **বলি**—'বলী'র সম্বোধনে; মধুসূদন বীরমাত্রেই নামের পূর্ব্বে এই বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন। ২৭। **গুণহীন**—'গুণ' অর্থে ধনুকের ছিলা। ৩৯। **সুধিবেন**—সুধাইবেন। ৫০। **আচার**—ইংরেজী conduct. ৫৬। **সরস'** (ক্রিয়াপদ)—সরস কর।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **সুধন্বি; মহাবাহু; পৌলস্তেয়; সর্ব্বভুক; দুর্ব্বার; কর্ব্বুরোত্তম; শিশির-আসারে; নিদাঘার্ত্ত।**

(২০)

কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গালীর যে উপকার করিয়াছিলেন (আজও বাঙ্গালীর পক্ষে উহাই একমাত্র খাঁটি বাংলা মহাভারত)—কবি মধুসূদন এই কবিতায় কাশীদাসের সেই কবি-গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপমাগুলি কেমন সার্থক হইয়াছে দেখ।

ছন্দ—এই কবিতার গঠন লক্ষ্য করিবে—ইহার ইংরেজী নাম Sonnet; মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ কবিতা লিখিয়াছিলেন,—তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'। পয়ার-ছন্দের চৌদ্দটি লাইনে বাংলা সনেট রচিত হয়। ইহার মিলের নিয়ম বড় কড়া; খাঁটি সনেটে দুইটি ভাগ থাকে—৮ লাইন ও ৬ লাইন। প্রথম আট লাইনের মিল—কখ খক, কখ খক—এইরূপ হওয়া উচিত: শেষের লাইনের মিল ইচ্ছামত হইতে পারে। সকল সনেটে এই নিয়ম রক্ষিত হয় না, এখানেও হয় নাই।

২। **ঋষি দ্বৈপায়ন**—মহাভারতের কবি বেদব্যাস। দ্বীপে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার উপাধি হইয়াছে 'দ্বৈপায়ন' (দ্বীপের বিশেষণ), 'ভগীরথ', 'সগরবংশ' প্রভৃতি গল্প মহাভারতে আছে।

৩। **সংস্কৃত হ্রদে**—অর্থাৎ যে জল একস্থানে বদ্ধ ছিল।

ভাষা পথ—এখানে 'ভাষা' অর্থে বাংলা ভাষা; সংস্কৃত ছাড়া আর সকল ভাষার সাধারণ নাম ভাষা। **খননি**—খনন করিয়া, মধুসূদনের এই নূতন ধরণের ক্রিয়াপদ-সৃষ্টি লক্ষ্য কর। ১০। **ভারত**—মহাভারত।

১১। **গৌড়**—বঙ্গদেশ—বাঙ্গালী। ১৩। এই লাইনটি অবিকল কাশীরামের মহাভারতে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে আছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **চন্দ্রচূড়-জটাজালে; ব্রতী; কবীশ।**

(২১)

মধুসূদন ও ইংরেজী ধরণের Stanza বা স্তবক-ছন্দ রচনা করিয়াছিলেন—কবিতাটিতে সেই ছন্দ খুব সুন্দর হইয়াছে। কবিতাটি আবৃত্তি করিবার উপযোগী মুখস্থ করিলে ভাল হয়। কয়েকটি সুন্দর উপমা আছে। অর্থ, প্রেম ও যশ—এই তিনেরই অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার কোনটাই পূর্ণ হয় নাই— শেষে কেবল হাহাকারেই জীবন শেষ হইল; ইহাই কবিতাটির মূল ভাব।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ, ছয় লাইনের Stanza বা স্তবক; লাইনগুলি—৮+৮ এবং ৬; মিল—ক খ ক খ গ গ ক; পঞ্চম লাইনে মধ্য-মিল আছে।

২৯। এ উপমার এখানে স্বার্থকতা কি? ৩১। **ব্যয়িলি**—অপব্যয় করিলি; পূর্ব্বের 'খননি' দেখ। ৩৫। অর্থাৎ যশ লাভ করিয়া এই হইল যে বহুলোক ঈর্ষা করিতেছে। ৪০। **পামর** মূর্খ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **অম্বুবিম্ব: সদ্যঃপাতি; ক্ষণপ্রভা; জলন্ত পাবক-শিখা।**

(২২)

এই কবিতাটি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল কাব্য' হইতে উদ্ধৃত। কবিতাটি খুব ভাল করিয়া পড়িবে—ইহার ভাব, ভাষা ও কল্পনা সবই চমৎকার। এই কবিতায় বিহারীলাল—আদি-কবি বাল্মীকির মুখে প্রথম শ্লোক বাহির হওয়ায় যে কাহিনী আছে—তাহাকে নিজে কল্পনার দ্বারা নূতন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাধের শরে নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য তাহার সহচরী ক্রৌঞ্চীর আর্ত্ত-চীৎকার শুনিয়া আদি কবি বাল্মীকির প্রাণে যে করুণার উদ্রেক হইয়াছিল তাহা হইতেই কবিতার জন্ম হইল—শোকই 'শ্লোক' হইয়া উঠিল। বিহারীলাল এই কবিতাটিতে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কবিতার দেবতা সরস্বতী

কবিরই মানসকন্যা; কবির হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য, কোমলতা ও পবিত্রতা তাঁহারও অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে, তাহা যখন বাহিরে কবিতারূপে প্রকাশ পায়, তখন তাঁহার নিজেরই বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। এই কবিতার আরও একটি অর্থ এই যে সর্ব্বজীবে করুণা প্রীতি ও প্রেমই কবিত্বের মূল-উৎস।

ছন্দ—স্তবক (Stanza)—পদভাগের ছন্দ। ৮ অক্ষর ও ১৪ অক্ষরের চরণ, চরণের সংখ্যা ঠিক নাই। মিলের পদ্ধতি লক্ষ্য কর।

২। **আলা**—আলো (যেমন, কালা—কালো)। ৬। **তামসী-অরুণ**—অন্ধকার হইতে ফুটিয়া উঠা ঈষৎ লোহিতবর্ণ। ১৮। **ধরণী লুটয়**—ধরণীতে লুটায়। ২৫। **সহসা ললাটভাগে**—ললাট মনুষ্যদেহের সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ স্থান। যত কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হয় ললাটের তলে—এইরূপ একটা ধারণা আছে। গ্রীক পুরাণে আছে যে মিনার্ভা বা বিদ্যাদেবী স্বর্গরাজ জুপিটারের ললাট ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৪৫। **বিলোচন**—বিশিষ্ট বা সুন্দর লোচন। ৪৭। **উত উত উতরোল**—'উতরোল' শব্দের 'উত' অংশটিকে এইরূপ দুইবার উহার পূর্ব্বে বসাইয়া কবি মূল শব্দের ভাবটিকে প্রবলতর করিয়াছেন; তুলনীয়—'হু হুঙ্কার'।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **বিকচ; তামসী-অরুণ; লোচনলোভা; রবিচ্ছবি; বিলোচন, উতরোল; উভরায়।**

(২৩)

এই কবিতাটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্য হইতে উদ্ধৃত। বিহারীলালের কবিতায় যেমন ভাবের সরলতা ও স্বাভাবিকতা একটু অধিক, তেমনই তিনি যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় সেই ভাব ব্যক্ত করেন; যেমন ভাষা তিনি নিত্য ব্যবহার করেন—আবশ্যক হইলে সেই ভাষায় অতিশয় চল্‌তি (colloquial) শব্দ কবিতায় ব্যবহার করিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কবিতায় ভাবের অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও কবিত্বময় ভাষারও অভাব নাই। তাঁহার কাব্যগুলি পাঠ করলে বুঝা যায় যে, ভাষার বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল। এই কবিতায় সাধু ও চল্‌তি শব্দের কিরূপ মিশ্রণ হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবে। এইরূপ হওয়ার কারণ—বিহারীলাল ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যেখানে যেমন

কথা আপনি আসিয়াছে, তাহাই লিখিয়াছেন। কবিতাটি পড়িলেই মনে হয়—কবি দূরে বসিয়া সমুদ্রের দৃশ্য কল্পনা করিতেছেন না, একেবারে সমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছেন। ইহাই কবিতার সৌন্দর্য্য। এই কবিতায় ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত—Roll on! thou deep and dark blue Ocean—roll! কবিতার ছায়া আছে।

ছন্দ—পয়ার ছন্দের চার লাইনে স্তবক (Stanza); মিল—কখ কখ।

৫। **কল্লোল**—বৃহৎ তরঙ্গ। ৭। **কানে 'তালা লাগা'**—চল্‌তি বুলি। ১৬। **ভ্রূক্ষেপ**—ছন্দ রক্ষার জন্য 'ভুরূক্ষেপ' পড়িতে হইবে। ৩৩-৩৬। এই চারিটি লাইনে ভাব বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। 'থরহরি'—এটি চল্‌তি শব্দ; 'থর থর' করিয়া কাঁপা অপেক্ষা 'থরহরি কাঁপা' আরও বেশী ভয়ের সূচনা করে।

আদি মনু—পুরাণের মতে, 'মনু' অনেকগুলি—এক এক মহাযুগের অধিপতি এক এক 'মনু', তাঁহাদেব ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। আদি মনুর নাম—'সয়ম্ভুব মনু'। এখানে 'আদি মনু' অর্থে 'আদি মানব' বুঝিতে হইবে। ২৫-৪৪। এই কয় পঙ্‌ক্তি ইংরেজ কবি বায়রণের বিখ্যাত কবিতার লাইনগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়—

"The shores are empires, changed in all save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they?
Thy waters washed them power while they were free,
And many a tyrant since, their shores obey
The stranger, slave or savage, their decay
Has dried up realms to deserts; not so thou;
Unchangeable, saw to thy wild waves' play;
Time writes no wrinkle on thine azure brow;
Such as Creation's dawn behind, thou rollest now."

—*Child Harold*

(২৪)

কবিতাটি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা কাব্য' হইতে উদ্ধৃত। সুরেন্দ্রনাথের কবিতার ভাব অপেক্ষা চিন্তার গভীরতাই বেশী; ভাষাও সংস্কৃতরীতিযুক্ত; বাক্যগুলি অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সমাসবহুল। এইরূপ রচনা এই যুগের আর

কাহারও নহে ; এইজন্য সুরেন্দ্রনাথের কবিতা অতিশয় মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। এই সঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মাতৃস্তুতি' কবিতাটিও পড়িবে—'প্রসীদ প্রসন্নমনা জননী আমার' ; এই কবিতার ছন্দ (২১) কবিতার মত—অথচ ভাষা একেবারে বিপরীত বলিয়া, কবিতাটির সুর কত ভিন্ন (২২) ; কবিতাটি 'গীতি-কবিতা,' এই কবিতা—'নীতি-কবিতা'।

ছন্দ—স্তবক (Stanza)—পদভাগের ছন্দ। ৮ অক্ষর ও ১৪ অক্ষরের চরণ।

৩। **রসাক্ত**—আর্দ্র, জলসিক্ত। ১১। পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বলিয়া। ২৪। **অদীন**—আত্মপ্রত্যয়যুক্ত ; সাহসী। ২৫। বাল্যকালে কল্পনা-শক্তি যেমন সহজ, বিশ্বাস করিবার শক্তিও তেমনি অপরিমিত হইয়া থাকে। ৪৮। **সুনিত্য**—চিরদিন। ৬০। **শেষ**—'শেষ' নাগ, আর এক নাম 'অনন্ত' ; তাহার মুখের সংখ্যা নাই, তাই এইরূপ তুলনা করা হইয়াছে। ৬৫। এই বিশ্ব যে শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা মাতৃশক্তি অর্থাৎ মাতাই জগদ্ধাত্রী।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **ঈশভক্ত ; অদীন-চিত ; মৃত্যুহরী ; অঙ্গত্রাণ ; ভবি-ভয়-বিবর্জ্জিত ; কন্দুক সমান।**

(২৫)

এই কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র কবিতা। এইরূপ কবিতাকে 'reflective', বা 'ভাবমূলক' কবিতা বলা যাইতে পারে। হেমচন্দ্রের কবিতায় এই ধরণের ভাবুকতা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় ; জাতির অদৃষ্ট, মানুষের ভাগ্য, জীবনের পরিণাম প্রভৃতির সম্বন্ধে অতিশয় সহজ আবেগময় চিন্তা ও তাহাতে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মিশাইয়া তিনি এমন কবিতা রচনা করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ পাঠকের মনেও একটু বৈরাগ্য ও বিষাদের ভাব জাগে। জগৎ, সংসার ও মানুষের ইতিহাস—এমন ভাবে ভাবনা করিয়া প্রাচীন কবিরা কবিতা লিখিতেন না ; অথচ কবিতার ভাষা ও ছন্দ, এবং ভাবের ভঙ্গিটি অতিশয় উপাদেয় বোধ হইত। এইরূপ কবিতাকেই যথার্থ পরিবর্ত্তন-যুগের কবিতা বলা যাইতে পারে—হেমচন্দ্র ছিলেন খাঁটি সেই যুগের কবি। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া এই কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে।

ছন্দ—স্তবক (Stanza)—পদভাগের ছন্দ, চরণ কয়টি, সকলের মাপ এক কিনা, এবং মনের গাঁথুনি কিরূপ—নিজেরা পরীক্ষা কর।

১। **মৃণাল**—(বাংলায়) পদ্মের ডাঁটা ; সংস্কৃত 'মৃণাল' অর্থের পদ্মের ডাল বা ডাঁটার সূত্র ; অথবা পঙ্কমধ্যস্থ পদ্মলতার মূল। ১১। **নিবন্ধন**—নির্বন্ধ। ১৩। **স্রোতঃশিলা**—কথাটির অর্থ এখানে খুব স্পষ্ট নয়। 'স্রোতের মুখে শিলাখণ্ডের মত'। ২১। মিশরের 'পিরামিড'। ৩০। **কুলে বাতি দিতে কেহ নাই**—একটি প্রচলিত বাক্য, অর্থ—'বংশে আর কেহ বাঁচিয়া নাই'। ৩২। গ্রীসের ইতিহাসে দুইটি বিখ্যাত রণস্থল—কাহিনী জানিয়া লইবে। ৩৩। **গিরীশ**—Greece. ৪১। **একাদি নিয়ম**—আদি হইতে এক নিয়ম, অর্থাৎ সমান প্রভুত্ব। ৪৬-৪৭। **রাজপথ দুর্গে য'র**, ইত্যাদি—ভাষাটি বড় সুন্দর। ৫৪-৫৬। **হিস্পানি**—স্পেন দেশ ; সিন্ধু ও হিন্দু একই নাম।

কাফের—অবিশ্বাসী, বিধর্মী। এখানে ইহার অর্থ অ-মুসলমান জাতি। **যবন**—মূল অর্থ য়ুনানী বা গ্রীক জাতি ; পরে শব্দটির কু-অর্থ হইয়াছে—অনাচারী জাতি। ৫৭। **'দীন'**—ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই বিশ্বাসে মুসলমান বীরগণ যুদ্ধকালে 'দীন্' 'দীন্' বলিয়া হৃদয়ে বল সঞ্চার করিতেন। (৪) ও (৫) স্তবক দুইটি মুখস্থ করিবে। ৬৫। **জগতের চক্ষু**—চক্ষু একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; অতএব, 'যে জাতির সহায়তায় জগত জ্ঞানলাভ করিয়াছে'। ৭৫। অর্থাৎ যাহারা এতদিন অন্ধকারে ছিল তাহারাই এইবার দীপ্তিলাভ করিবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **অবনীতে অপরূপ ; কুলে দিতে বাতি ; আকাশ পয়োধি-নীরে ; জগতীতলে ; পূর্ণগ্রাসে প্রভৃতি** প্রয়োগ কর।

(২৬)

কবিতাটি হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে আছে। মার্কিন কবি Longfellow-র "Psalm of Life" কবিতাটির অনুসরণে লিখিত ; তাহার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি এইরূপ—

"Tell me not in mournful numbers,
Life is but an empty dream."

ছন্দ ত্রিপদী—৮+৮+১০

৬। ইংরাজী কবিতায় আছে "Things are not what they seem." ৯। অর্থাৎ সুখ চাহিলেই দুঃখ পাইতে হইবে। ১৬। তুলনীয়: "নলিনী-দলগতজলমতিতরলম্। তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥—(মোহ-মুদ্গর); অর্থাৎ জীবন অতিশয় ক্ষণস্থায়ী, শৈবালোপরি জলবিন্দুর মত—একটু বাতাস লাগিলে যেমন জলবিন্দু জলাশয়ে পড়িয়া যায়, আয়ুও তেমনি যে কোন মুহূর্তে কাল-সাগরে মিশিয়া যাইতে পারে। ২১-২৮। এই কয় পঙ্‌তি মুখস্থ করিবে। ইংরাজীতে এইরূপ আছে—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime;
And, departing leave behind us
Footprints on the sands of time."

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **দারা-পুত্র-পরিবার; সংসার সমরাঙ্গনে; বীর্য্যবান; বরণীয়; সময়-সাগর-তীরে।**

(২৭)

এই কবিতাটিতে কবি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কবির কল্পনা নয়, একেবারে নিজ জীবনের মর্ম্মান্তিক অনুভূতি। এইজন্য কবিতাটির প্রধান গুণ ইহার আন্তরিকতা. সেই সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই অন্ধদশার যে দুঃখ তাহাও কেমন সত্য এবং গভীর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে দেখ। ইহার সহিত মহাকবি মিলটনের ঠিক ঐ অবস্থায় কাতরোক্তির তুলনা করিতে পার।

ছন্দ পদভাগের ত্রিপদী।

৭। অর্থাৎ দুইচক্ষু অন্ধ করিয়া। ১৭। এই পঙ্‌ক্তিটি ভাবে ও ভাষায় বড়ই করুণ। ২১। শিশির—শীতকাল। ২৬। কবি মিলটনের ভাষায় "The human face divine". ৩০। আর একটি অতি স্বাভাবিক দুঃখ—একটু ভাবিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **অবনী; দিনমণি; অচল; তমোময়; অংশুমালী; ভবেশ; ভবলীলা।**

(২৮)

কবির রচিত বিখ্যাত 'সদ্ভাবশতক'-এর কবিতা। কবিতার ভাব এতই যথার্থ এবং ছন্দ এত মধুর যে, ইহা একটি প্রবাদের মতো হইয়া গিয়াছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ, চৌপদী। প্রত্যেক চরণে চারিটি পদ আছে—প্রথম তিনটিতে ৬ অক্ষর এবং শেষে ৫ অক্ষর আছে।

(২৯)

বাংলায় 'যুদ্ধ কবিতা'—ইংরেজীতে যাহাকে "Battle-piece" বলে—প্রায় নাই বলিলেই হয়। এই কবিতাটি সেই হিসাবেই পড়িবে; ইংরেজী Hohen-linden, The Charges of the Light Brigade প্রভৃতি কবিতার সহিত তুলনা করিবে। 'পলাশীর যুদ্ধ' বাংলার ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা—তাহার কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান।

ছন্দ—চার চরণের স্তবক (Stanza); পদভাগের ছন্দ; চরণগুলির মাপ ও মিল, এবং সাজাইবার রীতি লক্ষ্য করিয়া স্তবকের গঠন বুঝিয়া লও।

৪। **আম্রবন**—সংস্কৃত বানান 'আম্রবণ'। ১০। **সদর্পভরে**—দর্পভরে। ৩৬। **সসজ্জিত**—সুসজ্জিত না, সসজ্জিত? ৩৭। **চিত্রিত প্রাচীর**—উপমাটি কেমন যথার্থ হইয়াছে বুঝিয়া দেখ। ৪০। একটি সুন্দর লাইন। 'রণপয়োধি' —উপমাটি কি কারণে সার্থক হইয়াছে? (১১) স্তবকটির বক্তব্য কোন্ অর্থে সত্য হইতে পারে? ৫৭। **বাধিল**—শব্দটির এখানে যে অর্থ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। শব্দের এরূপ অর্থ কোথায়, কি জন্য হয়? ৫৭। **নির্ঘাত**—(চলতি ভাষায়) 'অব্যর্থ'; এখানে 'প্রচণ্ড আঘাত' ৬০। উপমাটি সুন্দর হইয়াছে। ৬১। **নাচিছে**—অনিশ্চিতভাবে দোল খাইতেছে—কোন্ পক্ষের দিকে যাইবে ঠিক নাই। ৬৮। **অনুমতি**—আদেশ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত; অংসোপরে; কণ্টকাকীর্ণ, বজ্রনাদী; ব্যাজ; বীর-প্রসবিনী; অশনি-সম্পাত।**

(৩০)

এই কবিতাটি একটি বিখ্যাত কবিতা। ছন্দ এমনই সুন্দর যে পড়িলেই মুখস্থ করিতে ইচ্ছা হইবে। 'যমুনা-লহরী'—নামটিও কবিতার ছন্দের উপযোগী হইয়াছে। কবি দিল্লী-আগ্রার তল-বাহিনী যমুনার কথাই ভাবিয়াছেন—সেই স্থানে বসিয়াই এই কবিতা লিখিয়াছেন। যমুনার তীরে ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ যে-সকল বিখ্যাত নগরী ও রাজধানীর চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, তাহাদের বর্ত্তমান শ্রীহীন অবস্থা কবির চিত্তে যে বিষাদ ও বৈরাগ্যের ভাব জাগাইয়াছে তাহাই এই কবিতার কবিত্ব। মানুষের সকল কীর্ত্তি, সকল

মহিমাই নশ্বর—এ ভাবনার দীর্ঘশ্বাস এই কবিতার ছন্দের মধ্যেও বহিতেছে [তুলনীয়—(২৫)]।

ছন্দ—মাত্রা ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)।

৫। **ধবল-সৌধ-ছবি**—প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর শ্বেত অট্টালিকা, যেমন আগ্রার 'তাজমহল'। **জল-নীলে**—নীল জলে ; কবিতায় বিশেষ্য ও বিশেষণ এইরূপ ওলট-পালট হয়। যমুনার জল কালো বলিয়া প্রসিদ্ধ। জলে আকাশের প্রতিবিম্বের উপর এই শুভ্র অট্টালিকার প্রতিবিম্ব মেঘমালার মতো দেখাইতেছে। ৬। **নভ অঙ্গন**—মেঘ। ১৭। **শব ও সব**—দুইটি শব্দ শুনিতে একই ; ইহাও একরূপ শব্দালঙ্কার, অর্থাৎ কবিতার শব্দ-কৌশল। ২০। অর্থাৎ যে কালে তোমার তীরে বড় বড় রাজ্য ও রাজধানী বিদ্যমান ছিল, সেইকালে ভারতবর্ষ হইতে দেশ-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল। ভারতের সে-এক গৌরবময় যুগ।

৩০। **পয়ঃপারে**—স্রোতস্বিনী তীরে ; পয়ঃ অর্থে (এখানে) নদী। ৩৯। **কৌতুক**—খেলা, মিথ্যা অভিনয়। ৪১। **গৌরব, সৌরভ**—ঐশ্বর্য্যের মহিমা ও সৌন্দর্য্যের খ্যাতি। ৪২। **কাহিনী**—মিথ্যা গল্পমাত্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **তটশালিনী ; ধবল সৌধ ছবি ; নভ-অঙ্গন ; তুরগ গজ-ভারে ; শব নীরব ; কাল-কবল।**

(৩১)

ইংরেজীতেও কোন বীর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত খুব ভালো কবিতা আছে। বাংলাতেও আছে তাহার মধ্যে এই কবিতা—কবিতা-হিসাবে যেমন সরল, তেমনি আবেগপূর্ণ হইয়াছে। এই কবিতাটি হইতে তোমরা গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইবে। ইহাকে আমি পরিবর্ত্তন-যুগের কবিদের মধ্যে ধরিয়াছি এইজন্য যে—বিষয়, ভাষা এবং ছন্দের দিক হইতে কবিতায় আছে—নিজের অন্তরের ভাবকে তিনি অতি স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ কোন প্রচলিত আদর্শের শাসন মানেন না। ইহার প্রমাণ তাঁহার বেশীর ভাগ কবিতায় পাইবে ; এই কবিতাটিতে অবশ্য সেই লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ—এখানে কবিতার বিষয় সেরূপ নয়। তথাপি এখানেও একটা প্রাণখোলা অকপট ভাব আছে। গোবিন্দ দাস

রীতিমত ইংরেজীশিক্ষিত কবি ছিলেন না—এমন কি, খুব বেশী লেখাপড়াও তাঁহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি ভাষা ও ছন্দের উপরে তাঁহার অধিকার অসামান্য; এবং আধুনিক যুগের অনেক সংবাদ এবং অনেক নূতন জ্ঞানের পরিচয় তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি যে একজন শক্তিমান লেখক এবং জন্ম-কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ; ত্রিপদী। প্রথম চরণ—১৪ অক্ষর, পরে ৮+৮ এবং ১৩—এইরূপ চলিয়াছে।

৩। এই তিন লাইন মুখস্থ করিবে—একটি তা'রখকে কবিতার ভাষায় এবং ছন্দে কেমন স্মরণীয় করা হইয়াছে। ১০। **দ্বিজরাজ**—কোকিল (কি অর্থে জান তো?) ১৫। **নবীন**—কবি নবীনচন্দ্র সেন; **হেম**—কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; **অক্ষয়**—বিখ্যাত গদ্য-লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার; **চন্দ্রনাথ**—বিখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু ('শকুন্তলা-তত্ত্ব', ত্রিধারা', প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক); **দীনবন্ধু**-বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অতিশয় প্রিয় বন্ধু ছিলেন,; তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছিলেন; **'রায়'**—সম্ভবতঃ জগদীশনাথ রায়, বঙ্কিমচন্দ্রের আর এক বন্ধু; ইনি খুব বিদ্বান ছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সহচর ছিলেন, এবং ইঁহাদিগকে লইয়া একটি সাহিত্য-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯। **ছিন্ন-বাসা**—অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা। ৩৭। **নিমতলে**—কলিকাতার একটি শ্মশানঘাটের নাম 'নিমতলা'। ৪৩। **হৃতরত্ন রত্নাকর**—সমুদ্রকে মন্থন করিয়া দেব-দানবেরা তাহার রত্নরাজি হরণ করিয়াছিল। ৪৭-৫২। **ইন্দিরা** (লক্ষ্মী), **পারিজাত, সুধাকর, কল্পতরু, কৌস্তুভ**—এ সকল সমুদ্রমন্থনে উঠিয়াছিল। কবি কল্পনা করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেহভস্মের স্পর্শে সমুদ্র আবার তাহার হৃত রত্নসকল ফিরিয়া পাইবে, কারণ তুচ্ছ পার্থিব বস্তু স্বর্গীয় বস্তুতে পরিণত হইবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **দ্বিজরাজ; শ্যামা; ইন্দিরা; প্রবাল; কল্পতরু; পদ্মরাগ; কৌস্তুভ; ত্রিদিব।**

(৩২)

পুরাতন ও পরিবর্তন-যুগের সন্ধিস্থলে যেমন রঙ্গলাল, তেমনই পরিবর্তন ও আধুনিক-যুগের সন্ধিস্থলে আমরা কবি কামিনী রায়কে পাই। পরিবর্তন-

যুগের কবিতার দুইটি লক্ষণ প্রধান :—(১) ভাষা ও ভাব দুই-ই বাহুল্যপূর্ণ ও উচ্ছ্বাসময়; (২) জাতি ও সমাজের সঙ্গে কবিগণের সমপ্রাণত ; সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ তাঁহারা উচ্চ কল্পনা ও উন্নত আদর্শের চর্চ্চা করেন। আধুনিক যুগের কাব্য-প্রেরণা অন্যরূপ—কবিগণ নিজেদের মনের সূক্ষ্মভাব ও অভাব, আকুলতা ও অতৃপ্তিকেই প্রকাশ করেন, জগতের সব-কিছুকেই মনের রঙ রঙিন করিয়া সুন্দর দেখেন—সে বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহিত তাঁহাদেরও ভাবের ভাবুকতার যোগ নাই। কামিনী রায়ের কবিতায় এই আত্মভাবের প্রাধান্য আছে: সে যেন তাঁহার প্রাণের কথা, কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে সে প্রাণের মিল নাই দেখিয়া তিনি দুঃখ পান; অর্থাৎ তাঁহার কবিতার ভাব অতিশয় ব্যক্তিগত হইলেও তিনি সমাজ বা জাতিসাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। পরবর্ত্তী-যুগে এইরূপ ব্যক্তিগত ভাবের কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কবিতার উদ্ভব হইয়াছে,—সে কল্পনা আরও আত্মভাব প্রধান। কিন্তু এ কবির কল্পনা তত টা মুক্ত বা স্বাধীন নয়; ইঁহার কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি-পূজা বা সৌন্দর্য-প্রীতি অপেক্ষা নর-নারীর চারিত্রিক সংযম-সুষমাই গৌরবান্বিত হইয়াছে। কামিনী রায়ের ভাষাও অতিশয় সংযত ও পরিমিত। তাঁহার কবিমানস একদিকে যেমন পরিবর্ত্তন যুগের অগ্রগামী তেমনই অপরদিকে তাঁহার কল্পনার প্রসার অল্প, ভাষার ও ছন্দে আধুনিক গীত-কবিতার গভীর আকুতি বা অপূর্ব ধ্বনি-ঝংকার নাই। এই সকল কারণে কামিনী রায়কে পরিবর্ত্তন-যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত।

এই কবিতাটিতে কবি অতিশয় সরল ভাষায় এবং সংক্ষেপে যে কামনা বা প্রার্থনাটি রচনা করিয়াছেন তাহাতে গভীরতম জ্ঞানের পরিচয় আছে। এই প্রার্থনা মনুষ্যের পক্ষে যেমন সত্য, এমন আর কিছু নহে। ভগবানে উপর নির্ভরতাও যেমন, তেমনই নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই—যাহার যেটুকু শক্তি তাহাতে নিঃস্বার্থ বা অভিমানশূন্য হইলে, এবং সেই শক্তি জগতের হিতার্থে নিয়োজিত করিলে কোন মানুষেরই জীবন ব্যর্থ হইবে না। তাহাতে ছোট বড় নাই—সব মানুষই সমান। যাহার যেটুকু শক্তি তাহার বেশী কীর্ত্তি কেহই লাভ করিতে পারে না। অতএব সেইটুকু সম্পূর্ণভাবে করিতে পারাই মানুষ-হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব। তাই এই প্রার্থনাই মানুষের একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত। বাংলা ভাষায় এ ধরণের এমন উৎকৃষ্ট কবিতা আর নাই।

ছন্দ—একান্তর মিল—চার পঙ্‌ক্তির স্তবক, পদভাগের ছন্দ।

১। স্বার্থনাশের ভয়ই সবচেয়ে বড় ভয়। সাধারণ মানুষ বড় উচ্চ ভাব বা উচ্চ অভিপ্রায়কে বিশ্বাস করে না—পরিহাস করে; তাহাতে, অনেক সময় অসাধারণ বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ হয়। ৫। আমার কাজকে যদি তোমার কাজ বলিয়া মনে করিতে পারি তবে সে কাজ যতই ছোট হউক, আমার লজ্জা কি? ইহার সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজী কবি-বচনটি মিলাইয়া দেখিতে পার—

Honour and dishonour, from no condition rise,
Act well your part and there your honour lies.

১০। স্তবকটিতে কবি অতি সরল ভাষায় ও সহজ ভক্তির ভাবে গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোক স্মরণ করাইয়াছেন; যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

গীতার এই শ্লোকটি শিক্ষক মহাশয়কে দিয়া বুঝাইয়া লইবে। ১৫। ইহাও ভক্তের কথা। ভগবানের প্রতি প্রেম ত আর কিছুই নহে—নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাওয়া। নিঃস্বার্থ না হইলে মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে না, সেই জ্ঞানকে এখানে "প্রেমের আলোক" বলা হইয়াছে। যে তেমন নিঃস্বার্থ হইতে পারে, তাহার কোন ভয় থাকে না। তাহার মত বলবান কে? ১৬। তোমাকে পাওয়ার যে সুখ তাহাই শ্রেষ্ঠ সুখ—অর্থাৎ জগতের হিতে আত্মসমর্পণ করিলেই তোমার সহিত যুক্ত হওয়া যায় এবং তাহাতেই আত্মার তৃপ্তি হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **সমুদয় আপনারে; নিদেশ; বিভব; প্রেমের আলোক।**

(৩৩)

এই কবিতাটি কামিনী রায়ের—'আলো ও ছায়া' নামক বিখ্যাত কাব্য হইতে উদ্ধৃত। পড়িলেই বুঝিতে পারিবে, এই কবিতায় কবির প্রাণের যে অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাংলা কবিতায় একটু নূতন। এরূপ একটি কবিতাকে 'নীতি-কবিতা' বলিলে ঠিক হয় না; কারণ ইহার ভাবটি উপদেশ দেওয়ার ভাব নয়; অন্তরে যাহা সত্য ও মহৎ বলিয়া জানি, সমাজের ভয়ে তাহা কাজে করিতে পারে না—এজন্য যে আত্মগ্লানি, কবি তাহাই অতিশয় সরল বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পরকে উপদেশ দেওয়া নয়,—নিজের অন্তরের

কাতরতা প্রকাশ করা। তাহাতে এক উদার সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এই বাক্য যথার্থ হইয়াছে।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ – স্তবকের মতো ভাগ আছে, প্রত্যেক স্তবকে চারিটি-৮ অক্ষরের পদ; প্রত্যেকটি স্তবকে শেষ পদটি ইংরেজী 'Refrain'-এর মতো ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; বাংলায় ইহাকে 'আবৃত্ত-পদ' বলা যাইতে পারে।

২-৩। এই দুই লাইনে সব কথা বলা হইয়াছে; ভয়, লাজ, সংশয় সকলই লোকনিন্দার কারণে। ১৬। **শুভ্র-চিন্তা**—'শুভ্র' অর্থে পবিত্র; নির্ম্মল, স্বার্থশূন্য। এখানে ভাষায় একটু ইংরেজী গন্ধ আছে। ১৩-১৬। ভাবার্থ—এতখানি পরদুঃখ-কাতরতাকে লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে। ১৯। **উপেক্ষার ছলে**—অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে উপেক্ষা প্রকাশ করি। ২৫। **প্রাণ**—সৎকার্য্যে উৎসাহ।

(৩৪)

এই কবিতাটিতে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের একটি মহৎ নীতি প্রচারিত হইয়াছে। পাপকে ঘৃণা করিবে, কিন্তু পাপীকে ভালবাসিবে—ইহাই প্রকৃত নীতি, প্রকৃত ধর্ম্ম; কবি তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। এই কবিতাটি একটি উচ্চাঙ্গের 'নীতি-কবিতা'।

ছন্দ—পদভাগের চৌপদী; প্রথম লাইনে মিল-দেওয়া দুইটি ৮ অক্ষরের পদ; দ্বিতীয় লাইনেও দুই পদ আছে—৮+৬, মিল নাই, যথা—

উপহাস করি' কেহ | যায় পায়ে ঠেলে

১৩-১৬। এই চারিটি লাইনের উপমা ও ভাব বড় সুন্দর। ১৭। **জ্বালিয়া**—'জ্বালাইয়া' হইবে।

আধুনিক যুগ

এইখান হইতে আধুনিক যুগের কবিতা আরম্ভ হইল। পুরাতন যুগের কবিগণের মধ্যে যেমন চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র প্রধান, পরিবর্ত্তন-যুগের কবিগণের মধ্যেও তেমনি মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই প্রধান। কিন্তু আধুনিক যুগের একজন কবিই এত বড় যে, তাঁহার মতো আর কাহাকেও প্রধান বলা যায় না। এই কবি রবীন্দ্রনাথ। কেবল তিনজন কবি—দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল ও দ্বিজেন্দ্রলাল—রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী নহেন। বিশেষ করিয়া প্রথম দুইজন রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী এবং ইঁহাদের কাব্যভঙ্গি ও স্বতন্ত্র। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের মতই, কবি বিহারীলাল-প্রবর্ত্তিত নূতন গীতি-কবিতার ধারাটিকে নিজ ভঙ্গিতে প্রসারিত করিয়া বাংলা কাব্যে এই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা করেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নব নব উন্মেষ; এবং তাঁহার কবিতার বিচিত্র ও অফুরন্ত ধারা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষাকে এমনই সমৃদ্ধ করিয়াছে—এই যুগের কবিতার ভাষায়, ছন্দ ও ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেশী যে, এই যুগকে **রবীন্দ্রনাথের যুগও** বলা যাইতে পারে। পরিবর্ত্তন যুগের একটা পার্থক্য এই যে, এ যুগের সকল কবিতাই গীতি-কবিতা, এবং তাহার ভাবও অতিশয় নূতন। সেই ভাবের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য আছে;—প্রথমত, কবিদের ভাবনা, কামনা, ও কল্পনা বাহিরের বস্তু অপেক্ষা অন্তরের অনুভূতিকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। (কবি কামিনী রায় সম্বন্ধে মন্তব্য দেখ)। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে কবিরা নূতন চক্ষে দেখিতেছেন—তাহার রঙের যেমন অন্ত নাই তেমনই তাহার যেন একটা প্রাণ ও মন আছে—সেও যেন কথা কয়, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যেন কত দিক দিয়া কত রকমের যোগ রহিয়াছে। তৃতীয়ত, এ যুগের কবিতায়,—যত ক্ষুদ্র হউক—মানুষ হিসাবেই মানুষের মর্য্যাদা, তাহার মনুষ্যত্বের মহিমা—কবিরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষ সকল মিথ্যা, ভয় ও দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হউক, এই বাণী প্রচার করিয়াছেন। মানুষের সহজ সরল জীবনযাত্রা, এবং প্রকৃতিদত্ত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যকে কবিগণ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; এজন্য পল্লী-প্রকৃতি ও গ্রাম্য-কৃষকের চরিত্র বর্ণনা করিতে তাঁহারা বড় আনন্দ পান।

উপরে আধুনিক কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখিলাম তাহা ভাল করিয়া পড়িলে, এই ভাগের অধিকাংশ কবিতার ভাব সহজেই বুঝিতে পারিবে, এখন হইতে কবিতার ভাষাও ছন্দের দিকে আরও মন দিবে এবং বেশী করিয়া মুখস্থ করিবে।

(৩৫)

সমগ্র কবিতাটিতে Personification (সংস্কৃত—'সমাসোক্তি') নামক কল্পনা রহিয়াছে—প্রাকৃতিক ব্যাপারের উপর মানুষের ভাব আরোপ করা হইয়াছে। কল্পনাটি আরও চমৎকার হইয়াছে এইজন্য যে পুরাণের মদনভস্মের কাহিনী এখানে একটি প্রাকৃতিক ঘটনারূপে বর্ণিত হইয়াছে। মদন (প্রেমের দেবতা) তাহার পত্নী রতিকে সঙ্গে লইয়া মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গিতে গিয়াছিল। কিন্তু মহাযোগী রুদ্রদেবতা মহাদেব তাহার বাণ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার স্পর্দ্ধায় এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার ললাটের চক্ষু হইতে সহসা অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিল। এখানে বসন্তের মাস 'চৈত্র'ই—মদন; বসন্তকালের জ্যোৎস্নারাত্রি—রতি, এবং অগ্নিময় বৈশাখ—তপোমগ্ন রুদ্রদেবতা।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপরে এইরূপ মানুষী মূর্ত্তির আরোপ কবিতার আদিম যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে মানুষের মতই নানা ব্যক্তি অদৃশ্যরূপে কার্য্য করিতেছে, এইরূপ কল্পনা হইতে যাবতীয় প্রাচীন কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে; এইরূপ কল্পনাকে ইংরাজীতে "Mythopoetric Imagination" বলে। প্রাচীন আর্য্য ও প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে এইরূপ কল্পনা বেশ একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল। তাই গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য পুরাণ-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল; পরে সেই কাহিনীগুলি বড় বড় কবিদের হাতে পড়িয়া উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কল্পনা যে কবিত্বের একটা বড় লক্ষণ, তাহার প্রমাণ—এখনও কবিরা সেই কল্পনার বলে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতেছেন।

ছন্দ—ছয়টি পয়ার চরণের স্তবক।

১০। **নিয়তির ফেরে**—দুর্দৃষ্টের বশে, 'ফের'—বিপাক [তুলনীয়—ফেরফার (১)]। ১৩-১৪। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদন-ভস্মের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে; তাহাতেও আকাশ হইতে দেবতারা মহাদেবকে বলিতেছেন, "ক্রোধং প্রভো সংহর"। ২০। অর্থাৎ, বিধবা হইয়া বিলাস-চিহ্ন

ত্যাগ করিল, তাহার সে সৌন্দর্য্য আর রহিল না। ২৩। **করবীর**—করবী ফুলের (বাংলা 'করবী', সংস্কৃত 'করবীর')। ২৮। কারণ, খাল-বিল সব শুকাইয়া গিয়াছে। ৩০। **আতপে সন্তাষে**—আতপে (উত্তাপ) সম্বন্ধে কাতরোক্তি করে। (৫) স্তবকটিতে বৈশাখের বর্ণনা কেমন বাস্তব হইয়াছে দেখ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **কপালে কঙ্কণ হানি; বিভুতি-ভস্ম; রোষান্ধ; দিগঙ্গনা; নিঃসরিল; বাছনি; উপল।**

(৩৬)

কবিতাটি দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি উৎকৃষ্ট সনেট। অশোক গাছ লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে—সে যেন গাছের হাসি। কিন্তু গাছ যে কেন হাসিতেছে তা সে নিজে জানে না। কবি বলিতেছেন, এ যেন শিশুর হাসি,—হাসিরও কি কোন কারণ আছে? এই সনেটের প্রথম আট লাইনে কবি উপমার পর উপমা দিয়া হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শেষ ছয় লাইনে একটি আরও চমৎকার উপমা দিয়া, নিজের সেই জিজ্ঞাসার একটা গভীর কবিত্বপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। সনেটের এই দুই ভাগে—ভাবেরও দুই ভাগ এবং একটির দ্বারা অপরটিকে সম্পূর্ণ করিবার এই যে কৌশল—ইহাও উৎকৃষ্ট সনেটের লক্ষণ।

ছন্দ—সনেট; পূর্ব্বে দেখ (২০)।

৫। কখনও সধবা-অবস্থা না ঘুচে—এই কামনা করিয়া সধবা স্ত্রীগণ যে ব্রত-শেষে অপর সধবাগণকে শাঁখা, সিঁদুর ও শাড়ী দিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। কবি অশোকফুলের রঙ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, সে রঙের তুলনা খুঁজিয়া যেন শেষ করিতে পারিতেছেন না। ৮। **ব্রীড়াহাসি**—লজ্জার হাসি—মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠে। **চয়ন**—কেবল এই শব্দটির দ্বারা কবি হাসির রাশিকে ফুলের রাশি করিয়া তুলিয়াছেন। লাইনটিও অতি সুন্দর। ১০। **জাতিস্মর**—যে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারে। ১১। আলো ও অন্ধকারের মেশামেশীতে যেমন দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তেমনই; (উপমার গূঢ় অর্থে) জীবনে ক্রমাগত সুখ-দুঃখ, হাসি-কন্নোর দোল খাইয়া মন স্থিরভাবে কিছুই ধারণা করিতে পারে না—নিজের যথার্থ পরিচয় বিস্মৃত হয়। ১৩। **দেয়ালা**—অতিশয় অল্পবয়সের শিশুরা ঘুমন্ত অবস্থায় যখন হাসে তখন তাহাকে 'দেয়ালা' করা বলে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : ব্রীড়াহাসি ; জাতিস্মর ; শৈশবের আবছায়।

(৩৭)

কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শঙ্খ'-কাব্য হইতে উদ্ধৃত। এই কবিতার রচনাভঙ্গি ও ভাষা লক্ষ্য কর ; অতিশয় সংক্ষেপে এবং অতিশয় সুনির্ব্বাচিত শব্দের সাহায্যে কবি অতিশয় একটি গভীর সত্যকে যেমনই সরল তেমনই ভাবপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের কবিতার ইহাই বিশিষ্ট গুণ, কবিতাটির ভাবার্থ :—সাধারণ মানুষ আমরা—অতি উচ্চ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বিতর্ক আমাদের কোন কাজে লাগে না ; জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কাতরকণ্ঠে দয়া ভিক্ষা করি—আমাদের একজন ভগবান চাই, এবং তিনি যে দয়াময়, এই বিশ্বাস আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে।

ছন্দ—স্তবক—১৪ ও ১০ অক্ষরের একান্তর পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি মিলযুক্ত।

৩। অদৃষ্ট-অন্ধ নিয়তি বা অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম—প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির অর্থ ইহাই। ৪। যাহার জীবন যেমন, তাহার বিশ্বাস তেমনই, ওখানে দুঃখী অর্থে, দুঃখকেই বড় করিয়া দেখে যে—সেই দুঃখবাদী চিন্তাশীল মানুষ। সে দুঃখকেই একমাত্র সত্য বলিয়া জানে—হয়ত নিজে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, অথবা তাহার স্বভাবই ঐরূপ। আর একশ্রেণীর মানুষ জীবনে সর্ববিষয়ে সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়া দুঃখকে বা পরাজয়কে মানে না। তাহারা পুরুষকারবাদী ; তাহাদের মতে মানুষের ভাগ্য তাহার নিজেরই অধীন, মানুষ নিজেই জগৎকে শাসন করিয়াছে। ৫। জ্ঞানী—দার্শনিক ; যাহা ঘটে তাহা জানি, কিন্তু কেন ঘটে তাহা কিছুতেই জানা যাইবে না। ৭৮। ভক্তের কোন দুঃখ নাই, সেই মহাশক্তির নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—তাহার অনির্ব্বচনীয় মহিমা ও অপার রহস্য তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছে যে, সে জগতের যত-কিছু দুর্বোধ্য ব্যাপারকে সেই পরম পুরুষের লীলা বা উদ্দেশ্যহীন আনন্দময় কৌতুক বলিয়া সকল দুঃখ-কষ্টকে সেই কৌতুকের অঙ্গ বলিয়া মনে করে ; সে দুঃখ-কষ্ট সত্য নয় ভগবানে ভক্তি থাকিলে সেই দুঃখও একটি অপূর্ব্ব রসের অনুভূতি হইয়া উঠিবে। মহারাস—বৈষ্ণবের ভাষা। ['শেখর' কথাটির ঠিক অর্থ কি ? 'শিখর' ও 'শেখর' কি এক ?] ভূমান্—অর্থ বিরাট পুরুষ ; শব্দটির ঠিক রূপ কি ?

এই কবিতায় কবি যে-কয় শ্রেণীর মানুষের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের ভাব ও চরিত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: বিধি ও বিধাতা; কার্য্য ও কারণ; মহারাস; সুরসিকশেখর; দুজ্ঞেয়; ধ্রুব; বরেণ্য; ভূমান্; জীবযুদ্ধ।

(৩৮)

বাংলা ভাষায় এই ভাবের কবিতা—ভাবে, চিন্তায় ও কাব্য সৌন্দর্য্যে অনবদ্য, আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও হয়। কবি মানুষকেই মানুষের দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন চিন্ময় পুরুষ বা ভগবানরূপে যদি কেহ থাকেন, তবে মানুষের মধ্য দিয়াই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই তত্ত্ব নূতন নহে—বিশেষতঃ ভারতীয় চিন্তায় ইহার বহুতর ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু এক হিসাবে ইহা আমাদের বাংলা নূতন। কবি এখানে মনুষ্যের জীব-জীবনের ইতিহাসকে একমাত্র সাক্ষ্য বা প্রামাণ্য করিয়াছেন, এবং বিলাতী এভোলুশন (Evolution) বাদকে পুরাপুরি স্বীকার করিয়া মানুষের এক নূতনতর মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন আর নূতন নহে; কিন্তু তাহা হইতে তিনি যে 'মানব বন্দনা' রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাবনা ও রচনা শক্তির পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এই কবিতার ভাষায় কবির শব্দ-প্রয়োগ লক্ষণীয়; রচনা-রীতিরও ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন—ভাষা যেমন সরল তেমনি অতিশয় সংক্ষিপ্ত।

ছন্দ—মুক্তছন্দ স্তবক—অর্থাৎ পঙক্তি-সজ্জায় বা মিলবিন্যাসে কোন কারিগরি নাই। ১৪ ও ৬ অক্ষরের সহজ পয়ার ছন্দ, মিল হিসাবে ধরিলে প্রত্যেকটিকে দীর্ঘ ২০ অক্ষরের বলা যাইতে পারে; তাহাই সঙ্গত।

১৩। এই স্তবকে কবির কল্পনা ও বর্ণনা-শক্তি লক্ষ্য কর—ইহাকেই কল্পনার দৃষ্টিশক্তি বলে। ১৭। চীৎকারে—চীৎকার করে। ২৩-২৪। অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধি ও শক্তির বলে, আপনি আপনাকে উদ্ধার করিল। ২৭। কে—ইহাও প্রকৃতির প্রেরণা, প্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ ক্রমে ক্রমে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে—"Necessity is the mother of invention". ২৮। পত্রপুটে—কারণ, তখনও কোন শিল্পকর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই—মৃৎপাত্র বা তৈজসপত্র পাইবে কোথায়? এই স্তবকে কবি প্রকৃতির স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ৩৭। এতদিনে মানুষ কতক পরিমাণে সমাজস্থ হইয়াছে—পরস্পরের সহযোগিতা করিতে শিখিয়াছে। ৪৩। এই অগ্নিপ্রজ্বলন-কৌশল

যেদিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল সেইদিন হইতে মানুষ সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে—তখন হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। ৪৫-৪৮। প্রকৃতির গ্রন্থেই প্রথম বন্যাপাত—ঋতুভেদ প্রভৃতি; আবার প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর ও মহান্ রূপ-দর্শনেই তাহার অন্তরে প্রথম ধর্মভাবের উন্মেষ; সেই আদি ধর্ম-বিশ্বাসকে Natural Religions বা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা বলা যাইতে পারে। ৪৯। কৈশোরে—কবি মনুষ্য সভ্যতার তিনটি বয়স নির্দেশ করিয়াছেন—অতিশয় অস্ফুট সভ্যতার কালকে 'শৈশব' বলিয়াছেন; ভারতীয় বৈদিক যুগেরও আদিকালকে 'কৈশোর' নাম দিয়াছেন। এই স্তবকে বৈদিক সাহিত্যের শব্দ-গুলি লক্ষ্য কর—নিবিদ, ইন্দ্র, অগ্নি, যজ্ঞভাগ প্রভৃতি; নিবিদ্ বৈদিক মন্ত্র-বিশেষ। যজ্ঞভাগ—যজ্ঞে যাহা আহুতি দেওয়া হইত তাহার এক অংশ এক এক দেবতার প্রাপ্য ছিল—তাহাই যজ্ঞভাগ। ৬১। এতদিনে মানুষের যৌবন আসিল—মানুষের বুদ্ধি, বিদ্যা, কীর্ত্তি ও নানাবিধ সৃষ্টিক্ষমতা পূর্ণতা লাভ করিল। কবি বিশেষ করিয়া কোন্‌গুলির উল্লেখ করিয়াছেন দেখ; একদিকে যেমন আয়ুর্বিজ্ঞান, সমাজ-শাসনবিধি, কাব্য ও ইতিহাস—অপরদিকে তেমনি প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করিয়া Engineering বা যন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা; এই শেষোক্ত বিদ্যাই মানুষকে প্রকৃতির উপরে আধিপত্য দান করিয়া মহা-শক্তিশালী করিয়াছে—ইহাই সভ্যতার শেষ সোপান। ৭০। কার?—অর্থাৎ তাহার নিজের প্রতিভার। ৭১-৭২। এই পঙ্‌ক্তির ভাব-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য কর। এখানে 'হরি' অর্থে শ্রেষ্ঠ মানব অবতার। ৭৩। প্রবীণ সমাজ—এই সমাজই বহুকালের সাধনলব্ধ মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠান। কবিতার শেষ স্তবক দেখ। যৌবনের পর ইহাই প্রৌঢ়, অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতি; মানুষ তখন একা একটি বিশাল সমাজ বা রাষ্ট্র-জীবনে নিজের একক জীবন মিলাইয়া যেন একটা বিরাট পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সেই শক্তি যেমন একের শক্তি নয়, তেমনি একের শক্তি সকলের শক্তি বটে। এই স্তবকে কবি মানুষের সেই অসীম শক্তির গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৭৫। বিবর্ত্ত-বুদ্ধি—সৃষ্টির অন্তর্গত নিয়ম, যাহার বলে আদিম অবস্থা হইতে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সে যেন একটা 'বুদ্ধি', একটা লক্ষ্য বা অভিপ্রায়—যাহা ভিতরে ক্রিয়াশীল হইয়াছে, এইরূপ বিবর্ত্তন বা বিকাশ যাহার ফল। বিদ্যুৎ মোহন—বিদ্যুৎকে বা তাদৃশ শক্তিকেও যাহা মুগ্ধ বা বশীভূত করিতে পারে। ৭৭-৮৪। এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি, বিজ্ঞান—বিশেষ করিয়া physics বা পদার্থ বিজ্ঞানের বলে, মানুষ যে

সকল শক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহাই কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৮। **নীহারিকা**—দূরতম জ্যোতিষ্কপুঞ্জ। ৮৫। এই স্তবকে কবি মানুষের মহিময় মূর্ত্তিকে একটি দেববিগ্রহরূপে প্রকৃতির প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিতেছেন; এ কোন্ মানুষ? ইহা সর্ব্ব-মানুষের সেই শক্তি ও মহিমা—কোন একজন মহামানুষের নয় ইহা বুঝিয়া লইবে। ৯১। **উদ্‌গীথ**—বৈদিক স্তোত্রগান—এখানে 'অতিশয় গভীর বন্দনাগান'। ৯৩-৯৬। অর্থাৎ কাল ও দেশ এখানে তাহার ইচ্ছার অধীন। নিয়ম-অনিয়ম, সৃষ্টি ও ধ্বংস তাহার হুকুমে ত্রস্ত হইয়া আছে। অর্থাৎ মানুষই জগদীশ্বর হইতে চলিয়াছে। ৯৭। এই স্তবকে কবি আরও স্পষ্ট ভাষায় সেই বিরাট মানব ও মানবতার (Humanity) পূজা করিয়াছেন। ৯৯-১০০ এবং ১০৭ পঙ্‌ক্তি ভাল করিয়া বুঝিবে। ১০৩। একটি সুন্দর ও পরিচিত উপমা। ১০৭। কবি এই পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার আশ্চর্য্য বাক যোজানশক্তির পরিচয় দিয়াছেন; শব্দগুলি যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি সংক্ষিপ্ত—একটি সুন্দর Epigram-এর সৃষ্টি হইয়াছে; মধ্যগত মিলও লক্ষ্য কর। ভাবার্থ:—তোমার সমষ্টিগত সেই বিরাট রূপ আমাদের বরণীয়; আবার পৃথক ব্যক্তি রূপেই তুমি আমাদের প্রাণের প্রিয়, আত্মার আত্মীয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **মরুৎ-গর্জ্জন; কাণ্ড; শ্বাপদ-লঙ্ঘ; সরীসৃপ; খাদ্য; নবপল্লব; শালি-অন্ন; নিবিদ্; যজ্ঞভাগ; রাজ্যপাট; বিবর্ত্ত-বুদ্ধি; নীহারিকা; চূর্ণমেঘ; শষ্পভূমি; সুবর্ণ কলস; উদ্‌গীথ; ক্রমব্যতিক্রম; উদয়-বিলয়; আদ্বিজ-চণ্ডাল; কৃষি-তন্তুজীবী; স্থপতি-তক্ষণ; অদ্রি; বরেণ্য; শরণ্য।**

(৩৯)

সমগ্র কবিতাটিতে 'সন্ধ্যা'র বধূমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে—এবং সেই মূর্ত্তি সর্ব্বাংশে বধূর অনুরূপ করিয়া চিত্রিত হইয়াছে—পশ্চিম আকাশের দিনান্ত—ছবিটিকে কেমন একটি নারীর রূপ দেওয়া হইয়াছে দেখ।

ছন্দ—স্তবক। প্রথমটি ছাড়া আর সকলগুলি ছয় লাইনের স্তবক; পদ-ভাগের ছন্দ—১৪ ও ৮ অক্ষরের দুই প্রকার চরণ; মিল কখ খগ গখ।

৩। **তরল** (এখানে)—স্বচ্ছ। ১৩। **ক্ষীরোদ-সমুদ্র**—(পৌরাণিক) ক্ষীর সমুদ্র যাহাতে নারায়ণ বাস করেন। এখানে গভীর, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ—

এই তিন গুণ বুঝাইতেছে। **বিস্ময়-বিশ্রাম**—দিনের সকল কাজ সমাপ্ত করিয়া গৌরবময় বিশ্রাম। ১৬। **অলক-মেঘ**—সন্ধ্যার সকাশে যে ছোট মেঘগুলি দেখা যায়। **অলক**—চূর্ণকুন্তল; কপালের কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। এই সন্ধ্যা শরৎকালের সন্ধ্যা ১৭। **নৃত্য অভিরাম**—অর্থাৎ তারাটি দপ্ দপ্ করিতেছে। ১৮। **আথিবিথি**—আস্তে-ব্যস্তে। ১৯। **অলস**—গন্ধভারে

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **নব-নীলোৎপল; অলক-মেঘ; অভিরাম; আথিবিথি; পুলিন; পুরনারী।**

(৪০)

আমাদের দেশের একটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনা; পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য কবিতাটিতে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর। কবিতাটি মুখস্থ করিবে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ, প্রতি পর্ব্ব ছয় অক্ষরের, যথা—

নীল নবঘনে | আষাঢ় গগনে | তিল ঠাঁই আর | নাহি রে

(শেষের শব্দটি খণ্ডপর্ব্ব।)

১২। **ধবলী**—ধবলী নামক গাই। ১৮। **খোয়ালে**—হারাইল; নষ্ট করিল; (ক্ষোয়াইল—ক্ষয় করিল)। ৩৫। **নিচোল**—মেয়েদের বসন।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **ঝরঝর; দরদর; খেয়া-পারাপার; নিচোল; বেণুবন।**

(৪১)

রবীন্দ্রনাথের এক রূপক কবিতা। অর্থাৎ কবিতাটির বাহিরে যে অর্থ, সেই অর্থ ধরিয়া ভিতরে আর একটি গূঢ় অর্থ পাওয়া যায়। 'খাঁচার পাখী' অর্থে কারারুদ্ধ মানুষ বা পরাধীন জাতি বুঝিতে হইবে। সেই কারারুদ্ধ অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখের উপরেও যদি আরও বড় দুঃখ আসে, তবে সেই কারা-জীবনের বা পরাধীনতার বেদনা যে কিরূপ অসহ্য হয়, নৈরাশ্য যে কত গভীর হয়, এই কবিতায়, 'খাঁচার পাখী'র রূপকচ্ছলে কবি তাহা অতি গভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতার ছন্দ কৌশলও লক্ষ্য করিবে—মাত্রাবিন্যাসের বৈচিত্র্যে সুর কখনও উঠিতেছে কখনও নামিতেছে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ছন্দ, বিভিন্ন নামের ও মাত্রার ১২ পঙ্‌ক্তি লইয়া একটি স্তবক। মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, কিন্তু পঙ্‌ক্তি গঠনে এইরূপ বৈচিত্র্য আছে:—

(১) আজিকে গহন | কালিমা লেগেছে | গগনে ওগো (৬+৬+৫)

(২) হৃদয়-বন্ধু | শুন গো বন্ধু | মোর (৬+৬+২)

(৩) চিরদিবসের | আলোক গেল কি | মুছিয়া (৬+৬+৩)

—এইরূপ—যেখানে যেমন দেখ—ছেদ দিয়া পড়িবে।

৫। হৃদয়বন্ধু—পাখী যেন পিঞ্জরমুক্ত কোন স্বাধীন পক্ষী-বন্ধুকে সম্বোধন করিতেছে। মানুষের পক্ষে যাহা বুঝায় তাহা পরে দেখ।

৭। চিরদিবসের—এই অন্ধকার এতই গভীর যে মনে হইতেছে আর আলোকের উদয় হইবে না। ১৮-২৪। এই পঙ্‌ক্তিগুলির সহিত (৬১)-কবিতাটি পড়িয়া দেখ, ইহারই ভাব ও অর্থ তাহাতে যেন বিস্তারিত হইয়া উঠিয়াছে। নিখিল-বিশ্ব—সারা বা সমস্ত জগৎ। নিখিল—অখণ্ড। ২৭ তিমির-প্রান্ত চাহিয়া—এই বাক্যটির মধ্যে চক্ষের তীব্র আলোক-পিপাসা কেমন প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর। ইহাকেই উৎকৃষ্ট কবিভাষা বলে; বাহিরের বাস্তব বর্ণনায় অন্তরের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—অনুভূতির তীব্রতা তাহাকে রঙিন করিয়াছে। ৩১। এই কবিতার মধ্যে এই পঙ্‌ক্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী, পরের পঙ্‌ক্তি কয়টিতে তাহার কারণ দেখিতে পাইবে। ৩৪। খাঁচার পাখীর পক্ষে বাহিরের আলো কেবল দূর হইতে দেখিবার বস্তু—আকাশে উড়িয়া সেই আলোককে সত্যরূপে জানিবার বা ভোগ করিবার উপায় তাহার নাই।

৩৭। এই শেষ স্তবকে কবিতাটির রূপক-অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অথচ পাখীর পক্ষেও তাহা কেমন যথার্থ। অতি উর্দ্ধ আকাশে উঠিতে পারিলে মেঘের পারে সূর্য্যকে দেখা যাইবে। কিন্তু বদ্ধ-পাখী মুক্ত পাখীকে যাহা বলিতে পারে, বদ্ধ-মানুষ সেই অবস্থায় কাহাকে সম্বোধন করিয়া এরূপ বলিবে? এখানে হৃদয়-বন্ধুর রূপক অর্থ—মানুষের নিজেরই আত্মা, কবির অভিপ্রায় এই যে, দেহ ও মন যদিও কঠিন বন্ধনে বদ্ধ থাকে তথাপি মানুষের আত্মা যেন সেই বন্ধন না মানে, যেন ভয় না পায়, আলোকের—মুক্তির আশা যেন সে কখনও ত্যাগ না করে। তুলনীয়—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মনাং নাত্মানমবসাদয়েৎ"

(গীতা)—অর্থাৎ আত্মাকে অবসন্ন হইতে দিবে না, আপনার আত্মার বলে আপনাকে তুলিয়া ধরিবে; কারণ "আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধু"—অর্থাৎ, আত্মাই আত্মার বন্ধু।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: গহন; দিক-দিগন্ত; কুঞ্জভবন; শলাকা; নিখিলবিশ্ব; তিমিরপ্রান্ত; লৌহডোর।

(৪২)

ইহা একটি 'গীতি-কথা'র মতো কবিতা। স্থান ও কালের সঙ্গে একটি ঘটনা এবং তাহা হইতে দুইটি মানুষের দুইরূপ চরিত্রের পরিচয় ইহাই আমাদের মনে বিস্ময় এবং গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। গুরু যেমন অতিশয় নির্লোভ তেমনিই স্থির, শান্ত ও নির্বিকার পুরুষ; ইহাই খাঁটি ভারতীয় আদর্শ।

ছন্দ:—চরণগুলি পয়ার মতো; কিন্তু অক্ষর গণিবার সময়ে, শব্দের মধ্যে বা শেষে যে যুক্তাক্ষর আছে, তাহাই দুই অক্ষর ধরিতে হইবে, যেমন—

৩+৩+২ ৩+৩

নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল = ১৪

৮। পাহাড়গুলি অবশ্য অচল, কিন্তু এমনভাবে দিগন্তের দিকে ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে যে মনে হয়, যেন চলিতে চলিতে বাধা পড়িয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য বাংলার নয়, পশ্চিমাঞ্চলের। ১০। ভগবৎলীলা—ভগবানের অপূর্ব্ব ক্রিয়াকলাপের বিবরণ; ভাগবত-গ্রন্থ। ২৭-২৮। বর্ণনাটি দেখ। ৩৫-৩৬ আর একটি চমৎকার বর্ণনা। ৩৮। গুরু ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে তন্ময় হইয়া আছেন—তাঁহার অন্তরে এখন অন্য কোন চিন্তা স্থান পাইবে না। ৪২। উতলা—(এখানে) সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত। ৪৭-৪৮। গুরু শিষ্য রঘুনাথকে এইভাবে যেন ভৎর্সনা করিলেন; কারণ, সে এই ধনরত্নের উপহার দিতে গিয়া গুরুকে একরূপ অপমানই করিয়াছে। কিন্তু শিষ্যের প্রাণের ব্যাকুলতা গুরু যেরূপ কৌশল করিয়া উপেক্ষা করিলেন—তাহা যেমন আমাদিগকে চমকিত করে, তেমনি তাঁহার এইরূপ কঠিন নির্ব্বিকার ভাবও আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: রৌদ্র-বরণ-ফুল; নিবেশিল; প্রাণ-মন-কায়; যমুনা উতলা করি'।

(৪৩)

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র একটি বিখ্যাত কবিতা। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচারকালে, সেই ধর্ম্ম ও তাহার গুরু বুদ্ধের প্রতি অনুরাগের জন্য—গভীর ও অচলা ভক্তির জন্য—বুদ্ধের শিষ্যগণ কিরূপ শাস্তি ও দুঃখভোগ করিয়াছিলেন সে সকল কাহিনী 'অবদান শতক' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছিল। কবি তাহার একটিকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষায়, সুন্দর ছন্দে ও তাঁহার নিজস্ব কল্পনায় কি চমৎকার রূপ দিয়াছেন দেখ। এই কাহিনীর 'শ্রীমতী' চরিত্রটিকে তিনি তাঁহার 'নটির পূজা' নামক নাটকে আর এক রূপে আর এক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। এইরূপ কবিতায় ইহাই লক্ষ্য করিবে যে, বর্ণনার কোন্ কৌশলে কবি এত অল্প কথায় এমন একট কাহিনী রচনা করিয়াছেন।—কেবলমাত্র দুই চারিটি কথায় এমন একটি চিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ কবিতাকে ইংরাজীতে ballad বলে, বাংলায় 'গাথা' নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ কবিতার ছন্দ যেমন দ্রুত, ঘটনাও তেমনই সংক্ষিপ্ত হওয়া চাই। বাংলায় রবীন্দ্রনাথই এই ধরণের কবিতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের স্তবক। মূলচরণের পর্ব্বভাগ এইরূপ—

নমিয়া বুদ্ধে | মাগিয়া লইলা | পাদনখ-কণা তাঁর (৬+৬+৮)

মাঝের চরণগুলি (৬+৬)=১২ মাত্রার। মিল-বিন্যাস লক্ষ্য কর।

৩। বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁহার নখ, কেশ প্রভৃতি এবং মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহের অস্থি, দন্ত প্রভৃতি তাঁহার ভক্তেরা পরম আগ্রহে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপরে নানা আকারের সমাধিগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই সকলকে বৌদ্ধ স্থাপত্য-কলায় 'চৈত্য'—বা 'স্তূপ' বলে। ভারতবর্ষে বহুস্থানে এবং ভারতের বাহিরেও এইরূপ স্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে। ৪-১৯। অজাতশত্রু বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি সনাতন বৈদিকধর্ম্মের (পরবর্ত্তী কালের হিন্দুধর্ম্মের নয়) যাগ-যজ্ঞে এবং দেববিহিত সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য; অন্য কারণেও তিনি পিতার বিরোধী ছিলেন, এবং পিতাকে অনাহারে বন্দী রাখিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ১৬। **শোণিতের স্রোতে**—বুদ্ধশিষ্যগণের প্রাণবধ করিয়া; এই কবিতায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ১৮-১৯। ইহার অর্থ, তিনি বহুতর যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের বিধিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

২৭। এইখান হইতে কবি, পর পর তিনজন প্রধান রাজমহিলার—প্রত্যেকের ভয় এবং যাহার যেমন অবস্থা বা চরিত্র—সেইরূপ উক্তি কেমন সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য কর। রাজমহিষী, রাজপুত্রবধূ ও রাজকন্যা ইহারা সকলে মনে মনে বুদ্ধের অনুরাগিণী. কিন্তু সে অনুরাগ এমন নয়, যাহার বশে তাঁহারা রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যু বরণ করিবেন। শ্রীমতীর ভক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁহাদের সহিত তুলনায় যে কত গভীর তাহাই দেখাইবার জন্য কবি শ্রীমতীকে ঘরে ঘরে ঘুরাইয়া দেখাইতেছেন। যে সাহস বড়দের কাহারও হইল না, এক দীনহীন দাসীর তাহা হইল; সে যেন ওই বড়দের ভক্তি বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া সেই ক্ষোভ ধিক্কারে আরও কঠিন হইয়া মহাগুরু বুদ্ধের সম্মান রাখিবার জন্য নিজ জীবন বিসর্জন দিল। ৪০-৪৩। বর্ণনা ও ভাষা লক্ষ্য কর। ৫০-৫৩। রাজকুমারী ও রাজবধূর মতো অলস জীবন যাপন করিয়া থাকেন—দাসী শ্রীমতীর মতো কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁহাদের সে বলও নাই; বিশ্বাসের দৃঢ়তাও নাই। ৬৮-৭১ এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে অতি সংক্ষেপে যে-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। কবি কয়েকটি মাত্র অক্ষরে, সন্ধ্যা ও রাজপুরী এই দুইয়েরই চিত্র আঁকিয়াছেন—প্রাচীন ভারতের ছায়াও তাহাতে আছে। ৭২-৭৩। এইখানে কোলাতিক্রম' দোষ ঘটিয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে বলে 'anachronism, কারণ, একালে ভারতবর্ষে কোথাও মন্দির ছিল না, মূর্ত্তিও ছিল না, তখনও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। বেদের ধর্ম্ম কেবল যাগ-যজ্ঞ আছে—আর কিছুই নাই। ৯০। **মধুর কণ্ঠে**—তাহার কারণ তাহার হৃদয়ে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই—আততায়ীর প্রতিও নয়। ইহাতে তাহার মনে ধৈর্য্য এবং বুদ্ধের শিক্ষার প্রভাব দুই-ই সূচিত হইতেছে। ৯২। এই শেষ স্তবকে কবি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা কেবল ইঙ্গিতের দ্বারাই সমাধা করিয়াছেন। এইরূপ করার জন্য হত্যার উল্লেখ যেমন মধুর, তেমনই করুণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম দুইটি পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ স্পষ্ট হইলেও ভঙ্গিটি অতিশয় মার্জ্জিত (refined); সর্ব্বশেষের ক্ষুদ্র পঙ্‌ক্তিটিতেও তেমনি করুণরস ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **স্তূপ; শুচিবাস; পাদমূলে; সঁপি; পুরবাসী; অর্ঘ্যরচনা; অর্ঘ্যথালি; সৌধ; স্বচ্ছ-তিমির; বিষাণ, বন্দী মন্ত্রণাসভা, মুক্ত-কৃপাণে, পাষাণ-ফলক।**

(৪৪)

কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ যেমন অতি সহজ—প্রায় গদ্যের মতো, তেমনই ভাবও অতিশয় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী। এ কবিতাটির কোনখানে অর্থ ক'রবার প্রয়োজন হ'বে না। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা কেমন বলিষ্ঠ—অথচ মৌলিক গদ্য ভাষার মতো, তাহা লক্ষ্য কর।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ ('বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ)।

৫। নেতিয়ে গেছিস—(কথ্য ভাষা) সর্ব্বশরীর এলাইয়া শিথিল হইয়া গিয়াছে। ১১। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো—খুব চলতি উপমা সর্ব্বদাই ব্যবহার হয়। ১৩। পেয়ার (হিন্দী)—আদর। ১৮। সারা—'সারা' অর্থ 'সমস্ত'; এখানে 'আকুল'; 'হয়রাণ' অর্থও হয়; যেমন—'খেটে সারা'। ২৫। আবদার—শিশুদের অবুঝ প্রার্থনা: এ রকম শব্দের কোন প্রতিশব্দ হয় না—ওই অর্থে ওই শব্দটিই ব্যবহার ক'রবে। শিশুদের দিনের মধ্যে কতবার কত খেয়াল হয়—সে যেন স্নেহের ক্ষুধা। সেই খেয়ালের বস্তু না পাইলে তাহারা বড় অসুখী হয়; যাহারা ভালবাসে তাহাদের নিকটেই এইরূপ আবদার করিয়া থাকে। ২৯-৩৫। লাইন কয়টি বড় মর্ম্মস্পর্শী। ৪৪-৪৬। কথাগুলি বড় সত্য, বড় মর্ম্মান্তিক। ৫৮-৫৯। এই লাইন কয়টির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ৫৮। বাড়া—আরও বেশী (কু অর্থে—যেমন ইংরাজী 'worse'।

(৪৫)

দ্বিজেন্দ্রলালের একটি হাসির গান। "তা' সে হ'বে কেন!"—এই বাকটিতেই কবিতার মূল অর্থ ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতিতে, সংসারে—সর্ব্বত্র একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মকে না মানিয়া—কোন ব্যক্তি বা সমাজ আপনার ইচ্ছামত সুখ-সাধন করিতে পারে না। সে নিয়ম এই যে—শক্তি বুদ্ধি ও গুণ অনুযায়ী যাহার যাহা প্রাপ্য সে তাহাই পাইয়া থাকে; মূর্খতা আলস্য ও কাপুরুষতা সত্ত্বেও কেহ বড় হইতে পারে না; এবং কেবল আত্মসুখ ও স্বার্থপরতায় সমাজ রক্ষা হয় না।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ, অর্থাৎ হসন্ত-বাদ চার অক্ষরের পর্ব্ব অনুসারে ইহার ছেদগুলি পড়িবে। ইহাতে দুই রকমের লাইন আছে, এবং কোন কোন লাইনের গোড়ায় এমন একটি করিয়া শব্দ আছে যাহা ছন্দের বাহিরে পড়ে। যথা—

(তোমরা) দেশোদ্ধারটা। কর্ত্তে চাও কি। করে' মুখে ; বড়াই
তোমাদের ও। করপদ্মে দেশটা সঁপে' শেষে
(তোমরা) বোঝাতে চাও। হিন্দুধর্ম্মের। অতি সূক্ষ্ম। মর্ম্ম
অমনি তাই সব। বুঝে যাবে। যত শ্বেত। চর্ম্ম

—ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটুকু আছে তাহা ছন্দের—অর্থাৎ লাইনের—বাইরে আছে। আছে। শেষের ছোট পর্ব্বগুলি খণ্ডপর্ব্ব।

৩। **ফতে**—জয় ; বাংলা ভাষায় হিন্দীর (মূল—আরবী) প্রভাব লক্ষ্য কর। **করপদ্মে**—এখানে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ৯। **প্রচার কোরেই**—অর্থাৎ নিজে না আচরণ করিয়া। ৩। এই একটি বাক্যে বর্ত্তমানে হিন্দু জাতির সাধারণ চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, আসলে ওই দুইটি মহাদোষকে ঢাকিবার জন্যই তাহারা ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্বের দোহাই দেয়। ১৮ **তাড়া**—'তাড়না' হইতে ; 'মুখের তাড়া' (চলতি বুলি)—ধমক।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **তল্পিতল্পা ; লড়াই ফতে করা ; অগ্রগণ্য ; মুখের তাড়া ; আর্কফলা।**

(৪৬)

কবি মানকুমারী বসুর এই কবিতাটিতে তাঁহার নিজস্ব কাব্য-রীতির সকল সৌন্দর্য্য আছে ; ভাষা যেমন শুদ্ধ ও সরল, ভাব এবং ভাবের প্রকাশ তেমনই আন্তরিক ও আবেগপূর্ণ। ইংরেজী "To A Skylark" কবিতা এই সঙ্গে পড়িবে এবং তুলনা করিয়া দেখিবে। শেলী ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাই বিখ্যাত।

ছন্দ—পদভাগের ত্রিপদী (৮+৮+১৪) ; পদগুলি ঠিক একমাপের না হইলেও, এখানে যে স্তবকের রূপ দেখিতেছ, পুরাতন কবিতায় ত্রিপদী ছন্দেই এইরূপ স্তবক পাওয়া যাইবে।

৩। **আধ-আধ**—অস্ফুট। ৬। **মাতাইয়া কবি**—'কবি'র বিভক্তি নাই—'কবিকে' হইবে। বাংলায় বহুস্থানে বিভক্তি-চিহ্ন লুপ্ত হয় ; তাহারই নজীরে এখানে এইরূপ চলিতে পারে,—যদিও ইহা নির্দ্দোষ নহে। ১০-১২। এই কবিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। **জীব ভাগে**—অর্থাৎ জীব জগৎকে ; এই ভাগ বাহিরের কোন ভাগ নয় ; জড় ও জীব এইরূপ ভাগ বুঝাইতেছে। ৩৩-৪২। অর্থাৎ, তোমার এই গান বা সুরের এই যে মাধুর্য্য ইহা প্রকৃতির বক্ষ হইতেই উৎসারিত হইতেছে ; সৃষ্টিধারার মূলে যে সঙ্গীত আছে—ইহা

তাহারই শব্দময় প্রকাশ। সৃষ্টির প্রাণের এই সৌন্দর্য্য-প্রেম তোমার কণ্ঠে গান হইয়া উঠিয়াছে। ৪৩। **মধুরে**—বিভক্তি-যোগে, বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ হইয়াছে; অর্থ মধু স্বরে। ৪৫। **স্বরগ-দুয়ারে**—তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি একেবারে বিশ্বনাথের দুয়ার ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পার, আমরা ধরাতলে বসিয়া ডাকি।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা:—**কাঞ্চনের কৌটা; সজীব কুসুম; জলদ; জীব-ভাগ, জলস্থল; হিল্লোল; অমল কমল।**

(৪৭)

অতিশয় সরল, অনাড়ম্বর, স্বাস্থ্যপূর্ণ পল্লীজীবনের প্রতি কবির লোভ এই কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। সে-জীবনে, প্রকৃতির সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ আনন্দময় সম্বন্ধ, তেমনই, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তি অটুট থাকিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কবিতাটিতে কবি করুণানিধানের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও শব্দচিত্র রচনায় পরিচয় পাইবে।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক। বড় লাইনগুলিতে দুইটি পর্ব্ব এবং ছোটগুলিতে একটি পর্ব্ব ও খণ্ডপর্ব্ব আছে, যথা—

ছুট্‌ব আমি | সরল প্রাণে (৪+৪)
পর্ণ কুটীর | হতে (৪+২)

মিলের কৌশল ও লাইনগুলি সাজাইবার রীতি দেখিয়া লও।

৪। **আলিপথ**—মাঠের দুই চষা-জমির মধ্যে যে সরু সীমানা চিহ্ন থাকে; আইল, আ'ল। ২৬। **মোতির সাত নরী**—'সাত-নরী', সাত 'লহর' বা 'ধারা' ('হালি')-যুক্ত কণ্ঠহার। বড় বড় মুক্তার মতো জলবিন্দু ঘাসের উপর সাত-নরী-হারের মতো ছড়াইয়া পড়িবে। এখানে একটু ছন্দের দোষ আছে—পুরা ছয় (৪+২) অক্ষর (Syllable) হয় নাই। ২৯-৩২। একখানি 'চিক' রচনা করিবে, সেই চিকের ফাঁকে উচ্চ নারিকেল গাছের শ্রেণী এবং তাহার নীচে কেয়ার বন দেখা যাইবে। ৩৩। **মোয়া**—নাড়ু; নাড়; যেমন মুড়ির মোয়া, মুড়কির মোয়া,—তেমনই শিলের মোয়া (ball)। ৪৬। **'হেলা'**—হেলিয়া-পড়া। ৪৭। **সুড়ঙ্গ**—গর্ত্ত; সংস্কৃত 'সুরঙ্গ'। ৫৫। স্ফুলিঙ্গগুলি একসঙ্গে অনেক বাহির হয়, এবং ছোট বলিয়া যুঁইফুলের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে; 'আগুন-যুঁই' কথাটা বড় সুন্দর হইয়াছে। ৬৫-৬৬। ঘরে

প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, পথের মোড়ে আমাকে দেখিবার আশায়। **আগ বাড়ায়ে**—চল্‌তি বুলি (idiom) ; অগ্রসর হইয়া (অতিথিকে ঘরের বাহিরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য)। ৭১-৭২। এও নাম দুইটিতে পল্লীর বাস্তবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—ইহা একটি কবি-কৌশল। ৭৫। **স্বপ্নহারা**—অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা—স্বাস্থ্যের লক্ষণ। ৮০। **প্রাণের একতারা**—সহজ ভক্তি বা সরল বিশ্বাস। 'একতারা' অতিশয় সহজ বাদ্যযন্ত্র।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা :—**উজান যাব ; আদুল গায়ে ; সাঁতার কাটা ; কড়্‌কড়্‌ কড়্‌ ডাকবে দেয়া ; মুষল-ধার।**

(৪৮)

কবিতাটি আগাগোড়া একটি শব্দে-লিখিত বর্ণ-চিত্র। ওয়ালটেয়ার মাদ্রাজ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিখ্যাত শহর। এখানে সমুদ্র ও পাহাড় মিলিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বড় মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। লতাপাতার সবুজ, সমুদ্রফেনার শ্বেত, বালুকার পীত এবং তাহার উপর সূর্য্যকিরণ—এই সকলে যে বর্ণবিলাস, কবি ভাষার তুলিতে তাহার একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভূ সৌন্দর্য্যের সকল উৎকৃষ্ট স্থানের মতো এই স্থানটিরও তীর্থ গৌরব আছে—সীতার অন্বেষণে এইখানে আসিয়া রামের পথ সহসা রুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ প্রবাদ আছে।

ছন্দ—পূর্ব্ব কবিতার মতো।

২। **তালীবন**—দক্ষিণ দেশের সমুদ্রকূলে তালবন বা তালিবন আছে—কালিদাস ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; এই গাছ আমাদের তালগাছ নিশ্চয়ই নয়। ৫। **ঝর্ণা-ঝালর**—ঝালর, পাশাপাশি অনেকগুলি ফিতার মতো ঝর্ণার জল পাহাড় বহিয়া পড়িতেছে। **আলোকলতা**—সোনার সূতার মতো একরূপ পরগাছা। সম্ভবতঃ হিন্দী 'আলগ' অর্থাৎ পৃথক হইতে ঐ বাংলা নামটির উৎপত্তি হইয়াছে। ৫। সমুদ্রের জলের উপরে প্রতিফলিত হইয়া রৌদ্র আরও নির্ম্মল ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। ১৭। **গানের কলি**—'কলি' অর্থে একটি পদ বা সুরের অংশ। ২২। **সাগর-মরাল**—সাদা পাল-তোলা নৌকা। কূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে অর্দ্ধ-জলমগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল, যেন হস্তী-শাবকেরা জলক্রীড়া করিতেছে। ২৪। সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের উপরে আছাড়িয়া পড়িয়া 'শীকর-ঝারি' অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলরাশির সৃষ্টি করিতেছে। 'ঝারি'—(এখানে) বৃষ্টি।

৩৪। সুদূর-বিধুরতা—অতিদূর কালের সেই শোকস্মৃতি। ৪০। নীরব কথা—কারণ কেহ কাহারও ভাষা জানে না।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: ঝর্ণা-ঝালর; সাগর-মরাল; শীকর-ঝারি; আলাভোলা; বিধুরতা; তরু-বাকল-পরগাছায়।

(৪৯)

এই কবিতাটিতে বাংলার চাষী জীবনের এক সুন্দর অথচ বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়—তাদের তুলনায় আধুনিক ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষের জীবন ও চরিত্র কত বিপরীত, কবি তাহারই আভাস দিয়াছেন। এই কবিতাটির রচনায় একটি বড় কৌশল লক্ষ্য করিবে—একজনের কথাবার্তার ভঙ্গিতেই কবি এই খণ্ড কবিতাটি একটা ক্ষুদ্র নাট্য-চিত্র করিয়া তুলিয়াছেন।

ছন্দ—অক্ষরমাত্রিক ছন্দ। প্রতি লাইনে ছয় অক্ষরের তিনটি পর্ব্ব এবং দুই অক্ষরের একটি পর্ব্ব আছে, যথা—

মুখোস-পরানো | মোলাম মিথ্যা | বিনীত অহং | কার

৩। মোলাম—মোলায়েম। বিনীত অহংকার—বাহিরের বিনীত ব্যবহারে ভিতরের অহঙ্কারই ফুটে উঠে—সে বিনয় যেন গরীবের প্রতি এক প্রকার ব্যঙ্গ। ১০। ভোল—ছল। ১৯। দড়—দক্ষ, পাকা। ২০। কুড়িতে পড়িবে—বয়স উনিশ পূর্ণ হইয়া কুড়ি আরম্ভ হইবে। 'পড়িবে' শব্দটির অর্থ লক্ষ্য কর: ইহাকে ইংরজীতে Phrasal Sense' বলে। (ভূমিকা দেখ)। ২৪। ঠাট্—বাহ্য আচরণ। ৩১-৪০। এই অংশটিতে এই কবিতার সব চেয়ে মূল্যবান কথা আছে। মানুষ যদি সত্যকার মানুষ হয়, অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল হয়, তবে তাহার দুর্গতি হইতে পারে না। ৩৫। দিন্-দুনিয়াটা (চলতি-বাংলা) অর্থ, ইহলোক পরলোক (দিন্—ধর্ম্ম; দুনিয়া—জগৎ)। ৩৬। ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইলে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তমনই ভগবান মানুষকে খাটাইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছেন। ভাবার্থ:-মানুষ পরিশ্রমের দ্বারাই ভগবানের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখে। ৪০। সংহতি—একদিকে বা একমুখে প্রয়োগ করিলে যেরূপ দুর্জ্জয় হয়। ৪৫-৫০। যথার্থ শিক্ষার অভাবেই মনুষ্যের অধঃপতন হয়; যে শিক্ষায় ধর্ম্ম বাধের প্রয়োজন নাই—নকল সভ্যতা ও নিরর্থক মস্তিষ্ক-চর্চ্চা যাহার আদর্শ, সেশিক্ষার ফলে কেবল চাকরি-রূপ ভিক্ষায় বাহির হইবার একটা পোশাক মাত্র

মেলে। সে শিক্ষা লাভ করিয়া যাহারা কৃতার্থ হয়, তাহারা যেন ছিন্নমস্তার মতো নিজেদের মাথা কাটিয়া সেই রক্ত উল্লাসে পান করিয়া থাকে। বাহির হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—নিজেদের দেহ, মন ও প্রাণের প্রয়োজন-মত শিক্ষা নিজেদেরই ঠিক করিয়া লইতে হইবে; নতুবা সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ৪৮। **ভেক্**—'ভেক নাহিলে ভিখ্ মেলে না'—প্রবাদ-বাক্য। ভিক্ষা যাহাদের জীবিকা তাহাদিগকে একরূপ বেশ বা পরিচ্ছদ ধারণ করিতে হয়, তাহাকে 'ভেক' বলে। ৫৯। **এখো গুড়**—আখ (ইক্ষু) হইতে তৈয়ারী গুড়।

ভাষা ও শব্দ শিক্ষা: **হরেক রকম; আগড়; দড়; ছিন্নমস্তা ভোল; ভেক-নেওয়া; দেশ-জোড়া।**

(৫০)

একটি সুন্দর প্রকৃতি বর্ণনা—ভাবের সহিত ছন্দ কেমন মিলিয়াছে দেখ। তাহাতেই সন্ধ্যার স্তব্ধ গভীর শান্তিময় ভাব এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে; কবিতার এই সুর এবং কয়েকটি চমৎকার শব্দচিত্র সন্ধ্যাকে যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের চোখেও যেমন, অন্তরেও তেমনি।

ছন্দ—পদভাগের পয়ার, ২০ অক্ষরের চরণ; ভাগ এইরূপ ৮+৬+৬।

১-২। মাত্র এই দুইটি ছত্রে সরোবরের একটি সম্পূর্ণ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পঙ্‌ক্তিটিতে ছন্দের মধ্যে মঞ্জিরের শব্দ শোনা যাইতেছে। ইহাকে ইংরেজীতে বলে "sound echoing the sense."

১০। **মরাল শিশু**—পক্ষী বিশেষ। ১১-২২। এই দুই পঙ্‌ক্তিতে যে চিত্র রচনা হইয়াছে, তাহা সত্যই চমৎকৃত করে। 'ভ্রূবঙ্কিম রেখা' এই একটি উপমাতেই সমস্ত দৃশ্যটি চোখের উপর জাগিয়া উঠে। আকাশে বাদুড়ের শ্রেণী এমনভাবে, দুইটি যুক্ত বাঁকা-রেখায় উড়িয়া চলিয়াছে যে সন্ধ্যার ললাটে সে যেন একজোড়া ভুরু। ১৫-১৬। সন্ধ্যাকালে যে একটা অপূর্ব্ব শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, সে যেন কোন অদৃশ্য (অশরীরী) অনির্দ্দেশ্য ধারাযন্ত্র (কলযন্ত্র) হইতে উৎসারিত হইয়া সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **মঞ্জরীমালা; গোধন; দিনান্ত; নভস্থল; অশরীরী; কলযন্ত্র।**

(৫১)

সত্যেন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। শিশুর মৃত্যুতে কবি যে শোক করিতেছেন তাহার ভাষা যেমন সরল, ভাবও তেমনি আন্তরিক। শিশুর দেহের ক্ষুদ্রতা, এবং বয়সের অল্পতা—এই দুইটি কথা লইয়া তাহার মৃত্যুর ঘটনাকে কবি কিরূপ করুণ করিয়া তুলিয়াছেন।—প্রাণের সত্যকার অনুভূতির সঙ্গে কতকগুলো এমন চিন্তার উদয় হইয়াছে, যাহা বলিবামাত্র সকলের মনে সাড়া জাগাইবে। অতিশয় সহজ কথায় এমন গভীর শোকের প্রকাশ উৎকৃষ্ট কবিত্বের লক্ষণ।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দের স্তবক—প্রত্যেকটিতে আটটি সমান লাইন আছে। লাইনগুলি এইরূপ (দুইটি পর্ব্ব ও একটি খণ্ডপর্ব্ব) :—

ছোট থালায় | হয় নাক' ভাত | বাড়া
জল ভরে না | ছোট্ট গেলা | সেতে।

ছিন্ন-মুকুল—নামটির সার্থকতা কি? (মৃত্যু যাহাকে ছিঁড়িয়া লইল—ফুটিতে দিল না।)

১-৮। ছোট পিঁড়ি, ছোট থালা ও গেলাস—শিশুর জন্য এই যে আয়োজন, তাহাতে গৃহস্থ-ঘরের একটি বড় মধুর দৃশ্য মনে পড়ে; শিশুকে এমন করিয়া খাওয়ানো যেন স্নেহের একটি নিত্য-উৎসব। এমন করিয়া যাহাকে খাওয়ানো হয় তাহার বয়স কত অনুমান কর; সে-বয়সের শিশুর একটি বিশেষ মনোহারিত্ব আছে। কবি এই খাওয়ার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিয়াছেন। কারণ, প্রত্যহ আহারে বসিবার সময় সেই কথাই মনে পড়ে,—যে সকলের আগে খায়, তাহাকে আর কেহই খাইতে ডাকে না—এখন তাহাকে না খাওয়াইয়া সকলকে খাইতে হইবে। **'ঘুচেছে'**—এখানে এই ক্রিয়াপদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য কর। ১৫-১৬। বড়ই অপূর্ব্ব উক্তি। অন্ধকারে একা থাকিতে যে ভয় পাইত সে-ই—সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাহা, বড়রাও যাহাতে ভয় পায়—সেই মহা অন্ধকার ঘরের চাবি খুলিল, অর্থাৎ, মৃত্যুর গৃহে প্রবেশ করিল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান। **'ভয়-তরাসে'**—একটি চল্তি কথা (ভয়+ত্রাস)—সামান্য কারণে যে ভয় পায়। ২১। **পড়তে চোখের পাতা**—এক নিমেষে। ২২। **বিসর্জ্জনের বাজনা**—সম্ভবতঃ কোন প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে (বিজয়া দশমীতে) শিশুটির মৃত্যু হয়। ২৬। **বোল বলা সেই বাঁশী**—সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার আর একটি সুন্দর উদাহরণ। শিশুর 'আধ আধ' কথার

নাম 'বোল'। 'বাঁশীর' অর্থ—তাহার মধুর কণ্ঠস্বর। যাহার কথা শুনিলে মনে হইত, বাঁশী হইতে সুরের সঙ্গে বু'ল বাহির হইতেছে। ২৮। **দুধে-ধোয়া** —'ধোয়া' অর্থ লক্ষ্য কর; 'দুধের মত সাদা'। ৩১-৩২। 'ঘর' ও 'শ্মশান', এই দুইটি শব্দ কিরূপ বিপরীতার্থবোধক, তাহা লক্ষ্য কর। ৩৪। **মেলে**—(মেলিয়া)—ইহাও ভাষার কথারীতি (idiom)—'কাপড় মেলে দেওয়া' অর্থাৎ রৌদ্রে বিছাইয়া দেওয়া। ৩৯-৪০। এখানে অর্থ বিরোধ আছে তাহাই ভাবকে আরও সত্য করিয়া তুলিয়াছে—যে সব চেয়ে ছোট, অর্থাৎ যে ঘরের অতি অল্পস্থান জুড়িয়া ছিল, তাহার অপসারণে (আর সকলের থাকা সত্ত্বেও) ঘর শূন্য হইয়াছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **ভয়-তরাসে; টের (পেলে না); বোল-বলা; দুধে-ধোয়া; কচি দাঁতের হাসি।**

(৫২)

এই কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের অপর সকল কবিতা হইতে ভিন্ন; ইহার ভাষাও যেমন অতিশয় সাধু, সুন্দর ও সংযত, ছন্দও তেমনই ধীর গম্ভীর—নৃত্যচপল নয়। বনভূমির বর্ণনা, মঞ্জুভাষার রূপ-চিত্র ও কথোপকথনের অতিশয় স্বাভাবিক অথচ মার্জ্জিত মধুর ভঙ্গিট লক্ষ্য কর। চার্ব্বাক নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না। এইজন্য তাঁহার নামের সহিত একটা শ্রদ্ধাহীনতার ভাব যুক্ত হইয়াছে। তিনি একজন বড় বিদ্রোহী ছিলেন। কবি এখানে চার্ব্বাকের যৌবন বয়সেরই একটি ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন। চার্ব্বাক যে কেন ভগবানে বিশ্বাস করিতেন না, এবং একবার মাত্র কোন কারণে ক্ষণেকের জন্য তিনি ভগবানের মহিমা স্বীকার করিয়াছেন তাহাই কবিতায় বলা হইয়াছে।

মর্ম্মার্থ: জ্ঞানের অতিরিক্ত অনুশীলন মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করে—জীবনের দুঃখবোধ আরও বাড়িয়া যায়; কিন্তু হৃদয়ে যে প্রেম, স্নেহ প্রভৃতির উন্মেষ হয়, তাহা হইলে সকল দুঃখের মধ্যেও মানুষের প্রাণ আনন্দে থাকে, এবং সেই আনন্দের দাতারূপে ভগবানকে সে চিনিতে পারে। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, তাহার ভগবানও নাই। সৃষ্টির মাধুর্য্য যে অনুভব করিল না, সে স্রষ্টাকে জানিবে কেমন করিয়া? চার্ব্বাক শেষে নাস্তিক হইয়া ভগবান, আত্মা ও পরলোকে বিশ্বাস করিতেন না; যেমন করিয়া হউক জীবনে সুখ ভোগ কর—ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ।

ছন্দ—প্রধানতঃ চার লাইনের স্তবক—পদভাগের ছন্দ, প্রতি চরণে ১০ অক্ষর। মধ্যে ছন্দের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, স্তবকের লাইনগুলি সমান নয়—১৪ অক্ষর ও ৬ অক্ষর। মিলের রীতি সর্ব্বত্র এক নয়, তাহাও লক্ষ্য কর।

প্রথম তিনটি স্তবকে মধ্যাহ্নের বনভূমির বর্ণনা। ২ ও ১২-১২ পঙ্‌ক্তিগুলিতে মধ্যাহ্নের উত্তাপ ও আলোক কত সংক্ষেপে অথচ চিত্রবৎ বর্ণিত হইয়াছে। ৪। মধ্যাহ্নকালে প্রাকৃতিক রাজ্যে যাহা-কিছু চলিতেছে,—যেমন আকাশে মেঘের আনাগোনা, মাঠের প্রান্তে নদীর জলস্রোত, বনের ভিতর ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষশাখার আন্দোলন ও বায়ু-মর্ম্মর, অথবা আলো ও ছায়ার স্থান পরিবর্ত্তন—এ সকলের কিছুতেই যেন কোন কাজের তাড়া নাই, সর্ব্বত্র একটি অলস মন্থর ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। ১১-১২। বনতলে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির পত্রপুঞ্জের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ ধারার মতো ঝরিতেছে। **মদির**—উন্মাদক, এখানে 'তপ্ত'। মধুচক্র ও মধুর উপমাটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে। ১৫-১৬ **শিশিরের পদ্মকলিসম**—শীতকালে পদ্মকলি যেমন অন্তরে উত্তাপের অভাবে ফুটিবার সময় হইলেও ফুটিতে পারে না, তেমনি চার্ব্বাকের হৃদয় জ্ঞানের শীতল স্পর্শে যৌবনেও (ফুটিবার কালেও) ফুটিতে পারিতেছে না। দুই বিপরীত ভাবের টানাটানিতে ক্ষুব্ধ অথচ স্থির হইয়া আছে। ৩৩-৪২। 'মঞ্জুভাষা'কে কবি যথার্থ 'বনদেবী' রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন—উপমাগুলি দেখ। ৪১-৪৪। এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে ভাষার সৌন্দর্য্য চরমে উঠিয়াছে—মুখস্থ কর। **পর্ণরাশি-মর্ম্মর মঞ্জরী**—শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া চলিবার সময়ে যে মর্ম্মর-শব্দ হইতেছে—সে যেন তাহার পায়ের নূপুরের শব্দ। ৪৭-৪৮। আর প্রকৃতি অতিশয় ধীর বলিয়া মনের আনন্দ চোখে-মুখে উছলিয়া উঠে না, তাই তাহার গণ্ড দুইটি মহুয়া ফুলের মত ঈষৎ পাণ্ডুর। ৬৩। **চিত্রিত**—গোল গোল দাগযুক্ত (spotted)। ৮৭। **ভাষাহীন**—প্রাণ পূর্ণ থাকিলে বাক্য ফুরাইয়া যায়। ৮৯-৯২। আরম্ভের মন্তব্য দেখ। ৯৫। **নির্গুণ**—অর্থাৎ কেবলমাত্র সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারের দ্বারা ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা হয়; 'গুণ' অর্থাৎ কোন বিশেষণ নাই যাহার; মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-বাসনার অতীত নির্ব্বিকার পরম-পুরুষ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **দৃঢ় ওষ্ঠাধর; শিশিরের পদ্মকলি; বিধান; ডুবুডুবু; নীবার-মঞ্জরী; তন্তু; বাহু-লতা; চন্দ্রিকা; কিরাত; মরাল গমনে; মঞ্জুলীলাভরে; দয়ার ঠাকুর।**

(৫৩)

পুরাণের মতে ভগীরথ আগে আগে পথ দেখাইয়া গঙ্গাকে বহাইয়া সাগর-সঙ্গমে—কপিলাশ্রমে আনিয়াছিলেন (মহাভারত দেখ)। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া তিনি ভগীরথের নির্দ্দেশ মত দক্ষিণ-বাহিনী হইতে অসম্মত হইলেন। আরও পূর্ব্বে অনার্য্য দেশ; আর্য্যের নদী, পবিত্র জাহ্নবীধারা যেখানে প্রবাহিত হওয়া অনুচিত; কিন্তু গঙ্গা তাহা শুনিলেন না—বিদ্রোহ করিয়া আরও প্রবল ও বিশাল স্রোতে গঙ্গানাম ত্যাগ করিয়া পদ্মা-নামে সেই অনার্য্য দেশ বহিয়া চলিলেন। ইহাই পদ্মার পৌরাণিক ইতিহাস—তাহার বাস্তব ইতিহাস আমরা জানি। কবি সেই পুরাণ-কাহিনী ও সেই বাস্তবকে মিলাইয়া পদ্মার সেই প্রকৃতির জয়গান করিয়াছেন; তিনি তাহার সেই অস্থির দুর্দমনীয় স্রোতকে সকল শাসনলঙ্ঘনকারী, স্বতন্ত্র ও বিপ্লবের মূর্ত্ত শক্তিরূপে বন্দনা করিয়াছেন। একটি উৎকৃষ্ট কবিতা, চিহ্ন না থাকিলেও মুখস্থ করিবে।

ছন্দ – ১৮ অক্ষরের পয়ার; এইরূপ যতি দিলে ভাল হয়—৮।৮।৬

৩। **বলি**—পূজা-উপহার। ৭।১২। পদ্মার একটি নাম 'কীর্ত্তিনাশা', দুই কূলের যত প্রাচীন কীর্ত্তি ইহার অস্থির স্রোতের ভাঙ্গনে ধ্বংস হইয়া থাকে বলিয়া এই নিন্দার নাম। কবি সেই নিন্দাকেই প্রশংসায় পরিণত করিয়াছেন: সে কাহারও স্পর্দ্ধা সহ্য করিবে না, ধনী দরিদ্রের ভেদ সে রাখিবে না—সে সাম্যবাদিনী। ১৩। একটি চমৎকার পঙ্‌ক্তি—শব্দধ্বনি ও অর্থধ্বনি কেমন মিলিয়াছে দেখ। ১৬। এই লাইনটি সমস্ত কবিতাটির মূল তাৎপর্য্য বহন করিতেছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **ভগ্ন-মনোরথ; বলি; বিপর্যয়; অভ্রভেদী; সাম্যবাদী; স্বতন্ত্র; বিপ্লাবিনী।**

(৫৪)

ভাষায় ও ছন্দে, এবং অতি সুকুমার একটি ভাবের সুরে, কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা হইয়াছে। মুখস্থ করিতে পার। একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ হইলেও কবির নিজের কবিত্বের পরিচয়ও ইহাতে আছে—তিনি যে কবিতাটির ভাব নিজের অন্তরে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া আপনার ভাবে পরিণত করিতে পারিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই কবিতায় আছে: কারণ তাহা না

হইলে কবিতাটি ভাষায়, ছন্দে ও সুরে এমন স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিত না। যে ভাবটি অপর এক ভাষার শব্দগুলিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই ভাবকে আর এক ভাষায় শব্দের সাহায্যে আর এক ভঙ্গিতে ফুটাইয়া তোলাই কবিতার যথার্থ অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক অনুবাদ কবিতা এইজন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

জাপানী কুমারীদের এই 'বর-ভিক্ষা', অনেকটা আমাদের দেশের হিন্দু-কুমারীর শিবপূজার মতো। এ কথা ঠিক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নয়—জাতীয় বা দেশজ প্রথা জাপানীদেরও অনেক প্রাচীন কুলদেবতা আছে। এমনই এক দেবতার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা কিরূপ কবিত্বময়, তাহার প্রমাণ এই কবিতায় পাইবে।

ছন্দ—'বাংলা কবিতার ছন্দ' দেখ।

৩। 'চেরী' ও 'চন্দ্রমল্লি', এই দুইটিই জাপানের দুই বিখ্যাত ফুল। 'চন্দ্রমল্লি' বা 'চন্দ্রমল্লিকা'র আর একটি দেশী নাম 'গুল্ দাউদী'। ইংরাজী নাম—Chrysanthemum. ১১। পাহাড়ের নির্জ্জন সানুদেশে নিম্ন হইতে ঝরণার কলধ্বনি কানে আসিয়া পৌঁছে, তাহার মতো মৃদু ও মধুর আওয়াজ। ১৮। সে সুখে কোন তীব্রতা ও মাদকতা থাকিবে না। পরবর্ত্তী লাইনগুলিতে ইহার অর্থ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে সহজ, শান্ত, মধুর ও উদার ভাব আছে—সে সুখও যেন সেইরূপ তৃপ্তির সুখ হয়। ২৭-২৮। বাস্তব জীবনের সকল ভাবনা চিন্তার মধ্যেও যাহার সান্নিধ্য আমাকে সর্ব্বদা কবিতার রাজ্য স্মরণ করাইবে; অর্থাৎ হাত-পা মাটিতে বাঁধা থাকিলেও প্রাণ সর্ব্বদা সুন্দরের স্বপ্ন দেখিবে। ২৯-৩০। উপমাটি বড়ই সুন্দর—অর্থ বুঝিয়া দেখ। ৩৫-৩৮। এই কয়টি লাইনে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসের একটি সংস্কার, অতি গভীর ভাব-সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দুর মতো বৌদ্ধগণও জন্মান্তরবাদী; সেই বিশ্বাসেই কুমারী ওহারু তাহার ভবিষ্যৎ স্বামীকে জন্মজন্মান্তরের স্বামী মনে করিয়া গভীর প্রেম অনুভব করিতেছে। **'জন্ম তোরণে হারায়ে ফেলেছি'** —অর্থাৎ "এ জন্মে পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছি—জনতার মধ্যে উভয়ে উভয়কে হারাইয়া ফেলিয়াছি; হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি আঁকা আছে কিন্তু বাহিরে তাহার সাক্ষাৎ পাইতেছি না;—হে দেবতা, তুমি তাহাকে মিলাইয়া দাও।" ৪১-৪৪। এই লাইন কয়টিতে ভাবের সৌন্দর্য্য চরমে উঠিয়াছে। ৪১-৪৮। প্রত্যেক স্তবকের শেষে এই যে দুইটি লাইন (ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে) বার

বার ফিরিয়া আসিতেছে, এই—'refrain' বা আবৃত্ত-পদ' এ- কবিতার সৌন্দর্য্য কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। ইহার দ্বারা স্তবকের ছন্দ-সঙ্গীত যেমন মধুরতর হইয়াছে, তেমনই কুমারী পূজারিণীর মুখ ও বুকের সঙ্গে ফুলের সাদৃশ বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে, তাহার সেই রূপের মতই—অন্তরের পবিত্রতা ও সৌকুমার্য্য কবিতাটির মধ্যে আমরা আগাগোড়া অনুভব করিতেছি

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **চিত্তহারিণী; অভিরাম; গোপন সানুর মর্ম্মরসম; বাসন্তী চাঁদ; কাব্যভুবনে জোছনার মত; নিদাঘের শ্যামছায়া; অহরহ; জন্ম-তোরণে; জন-অরণ্যে।**

(৫৫)

এই কবিতাটি কবি কুমুদরঞ্জনের কবিত্বের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। কবিতার ভাবটি এই যে প্রাণের সরল বিশ্বাস ও সত্যকার ভক্তির আবেগে অশিক্ষিত ব্যক্তিও এমন কথা বলিতে পারে, যাহা পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র পড়িয়াও তেমন সরল অথচ গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। যুক্তি বা তর্কে যাহাকে ধরা যায় না—প্রাণের অকপট বিশ্বাসে তাহা অন্তরের সত্য হইয়া উঠে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগে ছন্দ; পর্ব্বচ্ছেদ এইরূপ—

শুভ ফাল্গুনে | দেখা হ'ল মোর - —
এক কৃষকের | সাথে

১৩। **ধর্ম্মরাজ**—গ্রাম্য দেবতা। **দেয়াসী**—মন্দিরের পূজারী বা পাণ্ডা ২০। **মাথায় গোবর ভরা**—চলতি বচন, অর্থ—'অতিশয় নির্ব্বোধ,। ২২। **ফোঁটা**—দোপাটি ফুলে এক রঙের উপরে আর এক রঙের ছোট ছোট দাগ থাকে। ২৪। **গরদ গোটা**—একখানি আস্ত গরদের কাপড়; কলাগাছের বাকলগুলি (গাছের ছাল। ছিঁড়িলে রেশমের মতো সূতা বাহির হয়। ৩২। **পিতে**—পিতা; কৃষক বলিতেছেন—পিতা কেবল ভরণ-পোষণ করিতে পারে; কিন্তু মা না হইলে এমন রং-বেরঙের পোষাক পরাইয়া সন্তানকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করে কে? অতএব যিনি, এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই পিতা নহেন—জননী। এই সঙ্গে ৪১-৪৪ পঙ্‌ক্তি-গুলি পড়। ৪৯-৫২। চণ্ডীপাঠ—চণ্ডী বা শক্তিরূপিণী পরমেশ্বরী (ঈশ্বরের

মাতৃরূপ)—শক্তি সাধকদিগের ইষ্টদেবতা। ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে যে-সংস্কৃত পুরাণে তাহার সেই অংশ পাঠ করাকে 'চণ্ডীপাঠ' বলে। কবি বলিতেছেন—তোমার এই মাঠই পবিত্র ধর্ম্মশিক্ষার স্থান, এবং তুমি তোমার অন্তরের পুঁথিতে সত্যকার 'চণ্ডীপাঠ' করিয়াছ।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **দেয়াসী: ঘুন্সী; পানা; ফুলকাটা; দোলাই।**

(৫৬)

এই কবিতার ভাবটি বড় মধুর, বড় সরল ও প্রাণস্পর্শী। কবি নিজের জবানীতে সকল মানুষের হইয়া বলিতেছেন, কাহারও জীবন নিষ্ফল হইবার কারণ নাই। বড় লোক যাহারা তাহারা কত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া জীবনে ও মরণে নিজেকে ধন্য মনে করে; যে গরীব, যে শক্তিহীন, সেও যদি তাহার সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায়, মানুষের প্রতি প্রীতির সাধন করে, তবে তাহাতেই এই সংসারে অনেকে তাহাকে অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে, তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে সেটুকু স্থানলাভ করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হইবে। কিন্তু যিনি কবি তাঁহার একটি বিশেষ সুবিধা আছে, তিনি তাঁহার কাব্যে সেই সকল সহজ প্রীতির দ্বারা সর্ব্ব বস্তুকে এমন অনুরঞ্জিত করিতে পারেন যে, সেই সকল বস্তু মানুষকে আনন্দ ও আশ্বাস দান করিবে, এমনই করিয়া তিনি যেন সেই সকলের উপর নিজের প্রাণ ও প্রীতি বিছাইয়া দিয়া তাঁহার নিজের স্মৃতিচিহ্ন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া যাইতে পারেন—তিনি যখন থাকিবেন না,—তখন মানুষ তাঁহার সেই গীতিগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার হৃদয়ের স্পর্শ লাভ করিবে, তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ, ছন্দভাগ এইরূপ—

পারবে না যা | করতে পরশ | কালের কর্ম্ম | নাশা

৩-৪। পথের ধারে গাছগুলিও তাঁহার ভালবাসার সাক্ষ্য দিবে। ৫। **ভিজায়ে**—বৃষ্টির জলে ধূলা-নিবারণ—সেও তাঁহারই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। ৬। **শ্যাম আসন**—সবুজ তৃণ। ৯-১৬। সেখানে যেটুকু দুঃখ নিবারণের উপায়, তাহাতেই তাঁহার আকুল অনুরাগ—সেইগুলিকে তাঁহার কবিতায় তিনি মধুরতর করিয়া তুলিবেন। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ,

ধরণীর তলে, গগনের গায়—
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়,

আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব ;
সংসার মাঝে দু'য়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু'য়েকটি কাঁটা করি দিব দূর,
তারপর ছুটি নিব।

২৫-৩২। এই পঙ্‌ক্তিগুলি ভাল করিয়া পড়। মানুষ মানুষকে কেবল একটি উপায়ে সহজে চিনিয়া লয়—সে পরিচয় প্রেমের, তাহারই নাম 'প্রণয়-রাখী'; এ রাখী বাঁধিয়া দিলে সে কখনও ভুলিবে না। আর কিছু নয় কেবল সেই প্রেমের টুক্‌রা টুক্‌রা নিদর্শন আমি আমার এই গানগুলির মধ্যে রাখিয়া যাইব। ('অনুভূতির ছিন্ন সূত্র')—কাল সকলই ধ্বংস করে (কর্ম্মনাশা নদীর মতো), কিন্তু এই প্রেমের প্রমাণ নষ্ট করিতে পারিবে না। ৩৩। এই শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবিতার অর্থ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁহার কবি নামে অমর হইতে চান না; তাঁহার একমাত্র কামনা তিনি মানুষকে যে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার সেই প্রীতির হাস্য ও বিশেষ করিয়া মমতার অশ্রু যেন মানুষের স্মৃতিতে তাঁহার একটু স্থান করিয়া দেয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **নিকায়ে ; ছায়াতরু ; বন-বিহগ ; দেউল ; কর্ম্মনাশা।**

(৫৭)

কবি এই কবিতায় যে বহ্নির স্তুতি করিয়াছেন—সেই বহ্নি জীব ও জড় সকলের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতেছে। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কবি তাঁহার নিজস্ব ভাব-কল্পনার কাজে লাগাইয়াছেন। ঐ বহ্নি যদি সৃষ্টির মূল তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে উহাতেই যেমন উৎপত্তি তেমনই উহাতেই লয় হওয়াই স্বাভাবিক —প্রলয়ের দেবতা যিনি তাঁহার ললাটে এই বহ্নিই জ্বলিতেছে। অতএব আমরা যাহাকে সৃষ্টির যতকিছু ভিতর ও বাহিরের শোভা বলিয়া জানি, তাহাও ঐ প্রলয়াত্মিকা বহ্নির বিবিধ ও বিচিত্র রূপ, সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে অগ্নির প্রচণ্ড দাহে বিশ্ব একদিন ভস্মীভূত হইবে, তাহার সেই দহন জ্বালাই,

কি আমাদের জীবনে····বিদ্যমান নাই? জীবনটা একটা দাহ—তাহার যতকিছু ভাব-অভাব সকলের মূলে আছে তৃষ্ণা বা কামনার জ্বালা—দুঃখও যা, সুখও তাই। সমস্ত সৃষ্টি, সকল জগৎ ঐ এক দহন-জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে—ঐ বহ্নিই একমাত্র সত্য, উহাই সৃষ্টির আদি ও শেষ, এমনকি যখন সবই ভস্মসাৎ হইবে, তখনও বোধ হয় ঐ চির অতৃপ্ত বহ্নিই অনির্ব্বাণ হইয়া থাকিবে। এই কবিতায় কবি সেই অনির্ব্বাণ দুঃখ-বহ্নিকেই অতি কঠোর বৈরাগ্য-গভীর চিত্তে তাঁহার প্রণাম জানাইয়াছেন। এই বহ্নিস্তুতি আর কিছুই নয়, তাঁহার দুঃখবাদেরই এক নূতন ভাষ্য।

ছন্দ—৬+৬+৮ এর পর্ব্বভাগ, প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি—৬+৬+৬+৩ যথা—

তপন-তপ্ত | চির-অতৃপ্ত | অনন্তরূপ | বহ্নি

১। **তপন-তপ্ত**—সূর্য যাহার তাপের পরিচয়। ২। অনন্ত রূপের কয়েকটি, ২-৪। শৈবণোজ্জ্বল রূপ। **কান্ত-ভয়াল**—একই মূর্ত্তি এইরূপ হইতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখ। ৫। পূর্ব্বের 'কান্ত-ভয়াল' দেখ। ৬। এই পঙ্‌ক্তির কবিত্ব লক্ষ্য কর। অর্থাৎ, তোমার তাপে যে মরীচিকা বা 'জল-ভ্রম' সৃষ্টি হয় তাহা দেখিতে মনোহর, কিন্তু তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়া প্রাণান্ত ঘটায়। ৭। তবু পতঙ্গের মত, সেই প্রাণান্তকারি বহ্নিকেই আমরা চাই, তাহাই যে আমাদের জীবনের উষ্ণতা রক্ষা করে। ৮। **অবিনশ্বর, ইত্যাদি**—যে প্রাণ বা যে জীবন কেবল নব-নব রূপ ধারণ করে—কিছুতেই ধ্বংস হয় না, তাহা তোমাতেই শেষে চির-মৃত্যু লাভ করে। অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। ৯-১২। জড়ে ও জীবে সর্ব্বত্র তোমারই শক্তি নানারূপে ক্রিয়া করিতেছে, 'আণব-নৃত্যে'—ঘূর্ণায়মান অণুপুঞ্জে, বুকে—অর্থাৎ শোকানলে বা তীব্র আনন্দে, 'জঠরে'—জঠরানলে বা ক্ষুধায়। ১২। মানুষের পরস্পরের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ তাহাও একরূপ তাপেরই ক্রিয়া—দুইয়েরই মধ্যে সেই যে হৃদয়ের সংযোগ-সাধন তাহা তোমার বলেই হইয়া থাকে। ১৩। **জীবনে কি বনে**—কথার এই ভঙ্গিকেই বাক্যালঙ্কার বলে, 'বনে' ও যেমন মানুষের জীবনেও তেমনি অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। ১৪। উর্পমাটি অতিশয় ঘোরালো, সহজ অর্থ—বুকের যে কামনা-বাসনা, এবং চোখের যে সৌন্দর্য্য পিপাসা—তাহার মূল একই, সকলই সেই এক তৃষ্ণার জ্বালা তোমারই আর এক রূপ। 'তৃষ্ণার শতদলে'—মানুষ তাহার সেই পিপাসাকে

বড় মধুর মনে করে, সে যেন প্রাণের মধ্যে পদ্মের মত শতদলে ফুটিয়া উঠে, তাহার গন্ধে সে আকুল হয়, কিন্তু সেই দলগুলি তৃষ্ণারই শিক্ষা, সে পদ্মের মর্ম্মকোষে তুমিই অবস্থান কর। ১৪। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, যাহাকে প্রাণস্পন্দন বলে—তাহাও একরূপ তাপ বা দহনের ক্রিয়া, অথচ তাহাকেই আমরা কত যত্নে রক্ষা করিতে চাই—এমনই তোমার কৌতুক। ১৫। দগ্ধগিরি—আগ্নেয়গিরি। ১৭। সকল দুর্ভাগ্যের মূলও তুমি—দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল শক্তির মূলে তুমিই আছ, কারণ, যাহা কিছু ঘটে তাহা তোমারই সাক্ষাৎ বা গৌণ প্রভাবে ঘটিয়া থাকে—সব সময়ে আমরা তাহা ধরিতে পারি না। ১৮। পূর্ব্ব পঙ্‌ক্তির ঐ কথার প্রমাণ-স্বরূপ একটি উদাহরণ। মেঘ কেমন করিয়া হয় তাহা তোমরা জানো। ২০। সুদিনে যাহা সঞ্চয় করি—দুর্দ্দিনের অভাব রূপ অগ্নিতে তাহা ভস্ম হইয়া যায়। ২২-২৭। ভূমিকা দেখ। 'ভস্মের মহাতাজ'—বাক্যটি শ্লেষযুক্ত ; সেই বিরাট ভস্মস্তূপকে বলা হইয়াছে এইজন্য যে 'তাজ' যেমন একটি গৌরবময় কীর্তি হইলেও, আসলে তাহা মৃত্যুরই মহিমময় আবরণ, তেমনই সে সেই মহাতাজও মহাধ্বংসেরই পরিচায়ক, অতএব তাহার গৌরব কি ? ২৮-২৯। এই দুই পঙ্‌ক্তিতে কবি-হৃদয়ে গভীর নৈরাশ্যের মর্ম্মান্তিক শ্লেষ কিরূপ ভাষায় ও উপমায় ব্যক্ত হইয়াছে দেখ।—

'শমী'—এখানে ইন্ধন-কাষ্ঠ অগ্নি যাহাকে সহজে দগ্ধ করিতে পারে—অগ্নির খাদ্য। 'আশীষ-দহনে'—মানুষ শমীকাষ্ঠের মতই শুষ্ক ও শীতল ; অর্থাৎ সুখের কামনা সে করে নাই, কিন্তু সৃষ্টি-নিয়মের অত্যাচার তাহাকে সেই কামনা করিতে হইবে, সেই বহ্নির দাস হইতে হইবে, এবং তাহার ফলে দুঃখের অসহ্য দাহ ভোগ করিতে হইবে, উপায় নাই, তাই সে সেই বহ্নির স্তুতি করিয়া তাহার দাহন-রূপ আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা—**তন্বী, কান্ত-ভয়াল, অবিনশ্বর, আণবনৃত্য, পরিবাহ, দাবানল শ্লেষ, মহাতাজ, বিভূতিভূষণ, সর্ব্বভুক, শমী।**

(৫৮)

এই কবিতায় এক নূতনতর অনুভূতির বেদনা উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি সেই একই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বিধান দেখিতে পান—

সেখানেও সেই একই নির্ম্মমতা : জীবনধারণের প্রয়োজনে সূক্ষ্ম হৃদয়-বৃত্তির অবকাশ কোথায় নাই। হাটের যেদিকে তাকাও দেখিতে পাইবে, সেই সৌন্দর্য্যের ত' কোন মূল্যই নাই—মূল্য আছে কেবল ভারের বা ওজনের ; পণ্যশালার অপর বিভাগও একটি প্রচ্ছন্ন হত্যাশালা। কবির সেই অনুভূতি যে শুধুই কল্পনা নয়—প্রত্যক্ষ সত্য, তাঁহার সেই অনুভূতিকে তিনি যে আমাদের হৃদয়গোচর করিতে পারিয়াছেন—ইহার জন্যই কবিতাটি এত সুন্দর।

ছন্দ—৬+৬+৮ এর পর্ব্বভাগ।

১-৪। কারণ মাঠের শস্য বা সন্তানগুলিকে লুঠ করিয়া হাট পূর্ণ করা হইয়াছে। পরের পঙ্‌ক্তি দেখ। ১১-১২। যেখানে তাঁহারা জন্মিয়াছিল সেই শ্যামল মাঠের ছবিই মনে পড়ে—হাটে দাঁড়াইয়া হাট দেখি না, সেই মাঠ দেখি। পরের পঙ্‌ক্তিতে, বর্ষার দিনে মাটে সেই চিত্তোন্মাদকারী শোভার কথা আছে। **'কয়াল'**—তৌলকার ; যে ওজন করে। ২০। একটি প্রবাদ বাক্য। ২৩-২৪। ভাষার ভঙ্গ লক্ষ্য কর—সরিষা ক্ষেতের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যখন ফুলের পর ফল, এবং শেষে বীজ দেখা দিল, তখনই সৌন্দর্য্য যেন সার-বস্তুতে পরিণত হইল—'দানা' বাঁধিল। ২৬-২৭। হাটের সঙ্গে মাঠের সম্বন্ধ ইহাই। ২৯। এইখান হইতে কবির অনুভূতি—কবিত্ব ও ভাষারও নিপুণ ভঙ্গি ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। ৩৩। **সোটা-বাঁধা বাঁধা**—'সোটা'র অর্থ লম্বা আঁটির আকারে বাঁধা। বাঁধা দুইবার প্রয়োগ করা হইয়াছে কেন? ৩৭-৩৮। **শ্যাম-বার্ত্তা**—শ্যামলতার সংবাদ। 'বার্ত্তাকি' 'বার্ত্তাকু'র শব্দালঙ্কার লক্ষ্য কর—এইরূপ যমক-রচনাই উৎকৃষ্ট, যেন আপনি ঘটিয়াছে ; ইহাই সত্যকার বাক্‌নৈপুণ্য। ৪১। 'লাউ কুমড়া' প্রভৃতিকে সুলভে বেচিবার জন্য চাকুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হয়—কি নিষ্ঠুরতা! 'ফালা দিল' চলতি ভাষা। ৪৩-৪৪। কিছুতেই তাহাদের জন্মভূমি বা জন্মমৃত্তিকার স্মৃতি সম্পূর্ণ ঘুচাইতে পারা যাইতেছে না। ৪৫। **মটুকিয়ে**—ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষ্য কর। ৪৯-৫০। 'গেরুয়া' কি অর্থে? ইহার সহিত 'বিবাগিনী' কেমন মিলিয়াছে দেখ। ৫১-৫২। আর একটা চমৎকার উৎপ্রেক্ষা। একজাতীয় কুমড়ার গায়ে সাদা গুঁড়ার লেপ থাকে—দেখিয়াছ? কোথাও দেশী কুমড়া, কোথাও ছাঁচি কুমড়া বলে। ৫৩। **নিরর্থ**—এখানে 'উদ্দেশ্যহীন'। ৫৬। 'মেছোহাটা' শব্দটি লক্ষ্য করিও। ৫৭-৫৮। কারণ বাহিরে জনতা থাকিলেও, মনে মনে তিনি একা, কেহই তাঁহার সঙ্গী নহে—কেহই তাঁহার মতো ভাবিতেছে না। ৬২। **সজল-স্মৃতি**—

দুই অর্থেই সত্য ; জলাশয় সম্পর্কিত, এবং অশ্রুসজল বা করুণ। ৬৯। 'জলের দুলাল' এবং 'ঢেউয়ের আঁচল' এই দুই কথায় কি গভীর মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন বিষয় ও এই ধরণের কবিত্ব আমাদের কাব্যে এই প্রথম। কিন্তু আসল কথা—ঐ ভাষা ; এই ভাষাই কবির অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক—উপমাগুলির মধ্যে গভীর অনুভূতি রহিয়াছে বলিয়াই ভাষাও এমন তীক্ষ্ণ ও সুন্দর হইয়াছে। এই কবিতার ভাষা তোমরা অতিশয় যত্নের সহিত—সব দিক দিয়া—বুঝিবার ও তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। ৭৫। এই পঙ্‌ক্তিটির শ্লেষ (irony) কি মর্ম্মস্পর্শী, দেখ। মরা মাছগুলিকে বরফে ঢাকিয়া রেল-ষ্টিমারে চালান দেওয়া হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **আঁচলের ধন ; শাওন-ঘোর ; কয়াল ; ভুলে ভোলিয়া ; সোটা-বাঁধা ; বার্ত্তাকু ; কন্দ : জনারণ্য ; বিবাগিনী ; নিতল ; দুলাল।**

(৫৯)

এই কবিতাটি—গ্রন্থকারের নিজের রচনা ; এইজন্য ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা শোভন নয়। কবিতাটি কেমন, সে বিচার তোমরাই করিবে। ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যাও আমি করিব না তাহার কারণ শুনিলে তোমরা খুশীই হইবে ; আমার কবিতার একটা বড় দুর্নাম আছে যে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না : তোমরা যদি কাহারও সাহায্য বিনা বুঝিতে পার, তবে আমার সেই দুর্নাম দূর হইবে। অতএব তোমাদের নিজেদেরই ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? তথাপি, তোমরা বুঝিতে পারিলে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য আমি একটু সাহায্য করিতে পারি। যেমন শিউলির বাপ কুলীন এবং রুক্ষ-স্বভাব হইবে কেন—কোন্ সমাজের কুলীন? বিয়ের আগেই 'গায়ে হলুদ'—কথাটা নিশ্চয় বুঝিয়াছ? ২১-২২। এই দুই লাইনের অর্থ কি? শিউলি স্বয়ম্বরা হইল, অর্থাৎ নিজের পছন্দ মতো বরকে বিবাহ করিল—তাহাতে তোমরা পছন্দ বা আদর্শ সম্বন্ধে কি বুঝিলে? জ্যোৎস্নার চেহারা এবং তাহার বেশভূষা ঠিক

হইয়াছে কি? ৩৫-৩৭। লাইন দুইটির অর্থ কি? ৪১। **নিশুতিরাত**—চল্‌তি ভাষায় 'নিশুতি' হইয়াছে। 'গ্রাম নিশুতি'-ও হয় (সংস্কৃত 'নিষুপ্ত' হইতে)—রাত্রের সেই প্রহর যখন চরাচর গভীর নিদ্রামগ্ন, নিস্তব্ধ (ইংরেজী - 'dead of night')। ৬৭-৬৮। এই ল'ইন দুইটির অর্থ কি বুঝিলে? এই কান্না শিউলিকে এত মুগ্ধ করিল কেন? কারণ এই নয় কি যে—ইহাতে শিউলি তাহাকে অতিশয় হৃদয়বান বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিল?—এ কান্না জগতের দুঃখ পাওয়ার কান্না।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ; প্রতি লাইনে তিনটি পর্ব্ব, ও একটি—এক বা দুই অক্ষরের খণ্ডপর্ব্ব; যেমন—

সবাই তারে | কেলবে চিনে | শিউলি যে নাম্ | তার্
বল যদি | দিন কয়ি এই | মাসের | একু | শে

[(১৩) লাইনের 'সেয়ানা তুমি'—এখানে ছন্দভঙ্গ হইয়াছে কারণ, ৪ অক্ষরের না হইয়া ৫ অক্ষরের পর্ব্ব হইয়াছে। পড়িবার সময় 'সেয়ানা' শব্দটি 'সেয়্‌না' এই রকম উচ্চারণ করিলে ছন্দরক্ষা হইতে পারে; আশা করি তোমরা এরূপ ছন্দভঙ্গ করিবে না।]

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **সমান ঘর; একটি টেরে; সেয়ানা; টোপর; জর্দ্দা; নিশুতি রাত; টের পাওয়া; আব্‌ছা; মাড়িয়ে; ('পাড়িয়ে' নয়); গলায় দড়ি; ছাদ্‌না তলা।**

(৬০)

একটি নূতন ভাবের সুন্দর কবিতা। মানুষের সমাজ ধনী-দরিদ্র অবস্থাভেদই মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। কবিতার মর্ম্মার্থ: দারিদ্র্য অপেক্ষা ধনীর অবজ্ঞাই অধিকতর দুঃখকর; ধনও সুখকর নয়—যদি চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্যের হাহাকার শুনিতে হয়। একদিকে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, আর একদিকে হৃদয়ে আঘাত লাগে। ইহাই মানুষের মতো কথা।

ছন্দ—স্তবকের মতো হইলেও ঠিক স্তবক নয়—কবিতার দুই ভাগ। পদ-ভাগের ছন্দ—সাধারণ ত্রিপদী, (১৪) কবিতা দেখ।

৬। **চল-নৃত্য**—'চল' অর্থ—চঞ্চল, অতিশয় দ্রুত। ৭। **সম্ভোগ সুখ**—'সম্ভোগ' শ্রেষ্ঠ ভোগ; যেমন, শুধুই ক্ষুধার অন্ন নয়—উৎকৃষ্ট অন্ন, শুধুই দেহের ভদ্র-আচ্ছাদন নয়—অতিশয় মহার্ঘ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক বেশ-ভূষ ইত্যাদি। ১১। **গিরির মেয়ে**—নদী, স্রোতস্বিনী। ১৯-২০। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা স্মরণ কর—'হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে'। ২৪। 'ঋতুরাজ বসন্ত'। 'পাখা না গুটায়' বলিলে 'কোকিল' মনে আসে; কবি হয়ত এই দুইটিকেই এখানে ভাবের অর্থে এক করিয়া লইয়াছেন। হঠাৎ যেন বসন্ত ঋতু বা আনন্দের দিন না ফুরায়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **কলতান; চল নৃত্য; সম্ভোগ সুখ; সে হাগ; ধিক্কার না হানে; ঋতুরাজ; মুকুলিত লতিকারা।**

(৬১)

এই কবিতাটিতে, কবি ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর [(১০) কবিতা দেখ] পরিচয়টিকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছেন—তাহার সেই সকল গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে ভক্তি, সন্তোষ এবং অলোভ—এই তিনটি মহৎ গুণ লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকেই খাঁটি বাঙ্গালী-চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য, দেবীর কাছে তাঁহার সেই একটি প্রার্থনা—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে', তাই অল্পে সন্তুষ্ট স্নেহপ্রবণ, শান্তিপ্রিয়, পল্লীপরায়ণ বাঙ্গালী জাতির যথার্থ কামনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছন্দ—ত্রিপদী, পদভাগের ছন্দ, আগের কবিতাটির মতো।

৩। **নৌকাবাঁধি বটতলে**—আমাদের দেশের খেয়াঘাটের বটগাছ স্মরণ কর। মাঝিরা সাধারণতঃ তাহাই করে। **বসিয়াছে পাটে**—এখানে ভাষার রীতি লক্ষ্য কর। অর্থাৎ আমি ত' তোর কাটের সেঁউতি সোনা করিয়া দিয়াছি। ১৭। **গাঙ্গিনী**—ভারতচন্দ্রের কবিতায় এই নামই আছে—এখন ইহা অপ্রচলিত। ২৪। **দাগা পেয়ে**—কথ্যরীতি—বিশেষ অর্থ, 'হৃদয়ে আঘাত পাওয়া'। **প্রত্যয় না পাই**—ইহাও একটি বক্রভঙ্গী, 'বিশ্বাস হয় না', 'ভরসা পাই না'। **দুধে-ভাতে**—পাটনী ইহার অধিক চায় না, ইহাও

কম নয়—শাক ভাত ও মাছ ভাতের চেয়ে অনেক বেশী, 'দুধ-ভাত' অর্থে—সচ্ছল অবস্থা। ৩৭-৪০। এক সুন্দর চিত্র। ৫৫-৬০। এই কথা কয়টিতে পাটনীর যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **পাটে বসিয়াছে; বলাকা; দাগা পেয়ে; সাধন-ভজনহীন; অলক্ত রঞ্জিত; দুধে-ভাতে।**

(৬২)

কবি নজরুল ইসলামের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বা গান। 'বাঙ্‌লা মা'র রূপ এমন করিয়া গানে বর্ণনা করিতে, এমন কবিত্বময় করিয়া তুলিতে আর কেহ পারেন নাই, কারণ এই কবিতায় আগাগোড়া 'বাঙ্‌লা মা'র চেহারা যেমন একটি জীবন্ত নারীর মতো হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই সেই নারীর বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ সুসংগত হইয়াছে, পরিচয়টিও বাস্তব ও যথার্থ হইয়াছে। এই কল্পনাও এক রকমের Personification—(৩৫)-কবিতা দেখ, কিন্তু এখানে বাইরের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি অপেক্ষা ভিতরের ভাব মূর্ত্তিটিই মুখ্য।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ। গান বলিয়া প্রথম দিকের লাইনগুলি কিছু ছোট। প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি ('আমার') ছন্দের বাহিরে ধরিতে হইবে। খণ্ড-পর্ব্বগুলি সর্ব্বত্র সমান নয়, কিন্তু সাধারণতঃ তিন অক্ষরে,—

৪ ৪ ৪
(আমার) শ্যামলা-বরণ | বাঙলা মায়ের | রূপ দেখে যা
৩
আয়রে আয়

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চিত্র এই লাইনগুলিতে বড় সুন্দর ফুটিয়াছে—৯, ১০, ১১, ১৫ এবং ১৭। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর ভাব জীবনের যে গভীর যোগ আছে, বাঙ্গালীর গানের কয়েকটি সুরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়, কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এই দুইটি লাইনে—৭ ও ১৮।

৬-৭। পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ শুষ্ক লাল মাটির দেশে (আসল রাঢ়ভূমিতে) যে উদাস ভাবের রূপটি জাগিয়া থাকে, কবি সম্ভবতঃ তাহারই আভাস দিয়াছেন। বৈরাগ্যের গানও বাংলাদেশে অল্প রচিত হয় নাই। ১০। **ঝারি—পূর্ব্বের**

(৬৮) কবিতা দেখ। ১২—১৯। এই লাইনগুলি মুখস্থ করিবে। সমস্ত কবিতাটিতে একটি অতি কোমল, করুণ, স্নেহপ্রবণ ও ভাববিহ্বল প্রকৃতির পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—বাঙ্গালী-চরিত্রের পক্ষে ইহা সত্য। ১৩। **বেদের সাথে সাপ নাচায়**—বাংলার খুব আদিম সমাজের একটু আভাস। ১৫। বাংলার ভূমি সমতল বলিয়া আকাশের কিনারা পর্যন্ত দেখা যায়। সেইরূপ দৃশ্যের জন্ম সন্ধ্যা-তারার বড় শোভা হয়। ১৮। **'বাউল ও ভাটিয়াল'**—এই দুইটিই খাঁটি বাংলা গানের রূপ। ইহার সহিত তোমরা 'কীর্ত্তন' যোগ করিয়া লইবে; এই প্রসঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই দুইটি লাইনও স্মরণীয়:—

"কীর্ত্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।"

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **বৈরাগিনী বীণ্ বাজায়; মেঘের ঝারি; ভাটির স্রোত।**

(৬৩)

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কবি Bengal Regiment বা 'বঙ্গ-বাহিনী'তে যোগ দিয়া আরবের মেসোপটেমিয়া প্রদেশের রণাঙ্গনে গমন করেন। ঐ কালে আরবের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া এবং তাহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাঁহার কবিহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং পৃথিবীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকরূপেও তিনি সেইকালে যাহা করিয়াছিলেন, এই কবিতায় তাহাই এক নূতন ছন্দে অতিশয় ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংরাজী কবি বায়রণের বিখ্যাত কবিতা "Isles of Grecce" এই সঙ্গে পড়িয়া লইলে ভাল হয়। 'শাত-ইল-আরব' একটি নদীর নাম। (বিদেশী শব্দগুলির অর্থের জন্য 'শব্দার্থ-সূচী' দেখ।)

ছন্দ—পর্ব্বভাগের চন্দ, সাধারণতঃ ছয় মাত্রার পর্ব্ব: শেষের পর্ব্ব ও মাঝে মাঝে তাহার প্রতিধ্বনির মতো যে একক পর্ব্ব আছে সেগুলি পাঁচ মাত্রার। এই একক পর্ব্বগুলিতে কবি প্রায় প্রত্যেক অক্ষরে (Syllable) মিল রক্ষা করিয়া পূর্ব্ব চরণের শেষ পর্ব্বটিকে কেমন প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবে; এবং পড়িবার সময়ও পর্ব্বটিকে ঐভাবে পড়িবে।

৭। **আঁশু আঁখে**—অশ্রুপূর্ণ আঁখি, 'আঁশু'—'অশ্রু' প্রাদেশিক রূপ। ১১। **নাচে ভৈরব,** ইত্যাদি—'**মস্তানী**' অর্থাৎ—উন্মাদিনীর মতো ভৈরব নৃত্য করে। ১২। **ত্রস্তা নারী**—ত্রস্ত নার, মিল-রক্ষার জন্য ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নাই—ইহা এক প্রকার 'poetic license.' 'দজ্‌লা' ও 'ফোরাতে' —টাইগ্রিস (Tigris) ও ইউফ্রেটিস (Euphrates)। ইহাতে বুঝিতে হইবে 'শাতিল' নদী ঐ দুই নদীরই যুগ্ম বা মিলিত ধারা। ১৬। **ইরাক-আজম**—মেসোপটেমিয়া। ১৯। এখানে 'সাহারা' সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—সাহারার মতো ভীষণ মরুভূমি। ২১। **নীল**—ক্রোধের সঙ্গে যেমন লাল, তেমনই ঈর্ষ্যার সঙ্গে নীল রঙের ভাব জড়িত আছে। ৩। **পিণ্ডারী**—ভারতের এক দস্যু সম্প্রদায়, এখানে সাধারণ অর্থে সেইরূপ দস্যু বুঝিতে হইবে। ২৫। **'জুলফিকার'**—হজরত আলির তরবারির নাম। 'হায়দারী' হাঁক—বীরের হুঙ্কার। ২৮। **বসরা-গুল**—বসোরার বিখ্যাত গোলাপ; পরের পঙ্‌ক্তি দেখ। ৩০। **খঞ্জরী**—(খঞ্জর—ছোরা) খঞ্জরধারী। ৩৩। এই স্তবকে কবি তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়াছেন—বাঙ্গালী হইয়াও তিনি কেন ঐ বহুদূর বিদেশের জন্য অশ্রু-মোচন করিয়াছেন। ৩৭। এই পঙ্‌ক্তিটিই কবিতার মর্ম্মকথা।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **বীর-নারী ; রক্ত-গঙ্গা ; বীরপ্রসূ ; বরেণ্য ; ধুঁকে মরে ; ঈর্ষ্যায় নীল ; ঝিলমিল ; ভাস্কর-টীকা ; কাহিনী।**

(৬৪)

এই কবিতাটিতে কবি গভীর ক্ষোভের সহিত দারিদ্র্যের দহন-শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। এই যুগে পৃথিবী জুড়িয়া অন্নাভাবের হাহাকার উঠিয়াছে—মনুষ্য-সমাজে কু-বিধি প্রবল হওয়ায়, বঞ্চিত বুভুক্ষুর দলই সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের সেই দুর্ব্বল দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থাকেই কবি একরূপ বিষজ্বালার উদ্দীপনারূপে—এক মহাশক্তিরূপে—বন্দনা করিয়াছেন, আবার, নিরুপায়ভাবে সেই অমঙ্গলকে বক্ষে বরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাসও ফেলিয়াছেন।

ছন্দ—১৪ অক্ষরের—পদভাগের ছন্দ,—ইহাই আধুনিক পয়ার। ইহার লাইনগুলি মিলের জায়গাতেই থামে না—পরের লাইনের কোনখানে গিয়াও থামিতে পারে।

খ্রীষ্টের সম্মান কণ্টক-মুকুট-শোভা—খ্রীষ্টের ললাট বিদ্ধ ও রক্তাক্ত করিয়া একটি কাঁটার মালা পরাইয়া, খ্রীষ্ট শত্রুগণ তাহাই তাঁহার রাজমুকুট বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের সেই বেদনা ও লাঞ্ছনাই তাঁহাকে জগৎপূজ্য করিয়াছে। যাহার কিছু নাই, এবং কোন আশাও নাই তাহার সত্যকথা বলিতে কোন ভয় থাকে না। ৫। **দর্পী তাপস**—সব হারানোতেই যাহার গর্ব্ব। ৬। আমাদের দেহের স্বর্ণ-কান্তিকে বিবর্ণ করিয়াছে। **বিরস**—মলিন, বিবর্ণ। ৭-১০। দারিদ্র্যের পক্ষে সর্ব্ববিধ রসচর্চা—প্রাণের উচ্চতর পিপাসা চরিতার্থ করা—অসম্ভব। ১২-১৬। দরিদ্রের বলবৃদ্ধি হয় দারিদ্র্যের জ্বালায়—অতএব দুর্ব্বল দরিদ্রের পক্ষে জ্বালাহীন অমৃত উপকারী নয়। ১৬। 'কালিয়া' (বা 'কালীয়') নামক সর্প বৃন্দাবনে যমুনার এক দহে বাস করিত, এখানে সেই পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত (allusion) রহিয়াছে। ১৭-২৪। এখন দুর্ভিক্ষের আর কালাকাল নাই, সেই দারুণ অন্নাভাবে পৃথিবীময় যেমন একটা পৈশাচিক নরমেধ-যজ্ঞ চলিতেছে এবং ক্ষুধাতুর মানুষের দল আক্রোশের বশে ধনীদের যত কিছু শ্রী ও সম্পদ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২৫-২৭। দারিদ্র্য মানুষকে যতই কঠিন করিয়া তুলুক, এক জায়গায় হৃদয়কে বড় দুর্ব্বল করে—যখন সেই দারিদ্র্যকে সে স্ত্রীপুত্রের চক্ষে অশ্রুধারারূপে দেখিতে পায়। ২৯। **আগমনী**—দুর্গাপূজার 'আগমনী'—অর্থাৎ, উৎসবের আনন্দগান: দরিদ্রের কানে তাহাও ক্রন্দনের মত শোনায়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **দুরন্ত সাহস; বুভুক্ষু, করপুট; কল্পলোক; মৃত্যুপথ-যাত্রিদল; কিরীট।**

(৬৫)

এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, তোমরা শহরের ভদ্র-সমাজে যাহাকে রূপবান যুবা বল, তাহার তুলনায় গ্রামের চাষী যুবক কুৎসিৎ ত' নহে-ই, বরং তাহার সেই কালো স্বাস্থ্যবান দেহে এমন একটা লাবণ্য আছে যাহা তোমাদের ঐ শহরে বাবুদের নাই। হঠাৎ এমন কথা শুনিলে তোমরা হয়ত হাসিবে, কিন্তু কবিতাটি পড়িবার পর তোমরাও স্বীকার করিবে যে কবি মিথ্যা বলেন নাই।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ; (৫৮) কবিতা দেখ।

কবি জসীমউদ্দীনের একটি সুন্দর কবি-গীতি। জগৎকে যে ভালবাসে সেই যথার্থ কবি; সেই ভালবাসা সাধারণ ভালবাসা নয়, তাহা হইলে সকলেই কবি হইতে পারিত। এই কবিতায় কবি বলিতেছেন, কেহ তাঁহার শত্রু নাই বরং সকল শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষের মধ্যে তিনি ইহাই অনুভব করেন যে কোন্ এক মহাপ্রেমিক তাঁহার প্রেমের পরীক্ষাছলে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট দিতেছেন মানুষের মধ্যে তিনিই আছেন, কোন একজনের মধ্যে নয়, সকলের মধ্যে; তাই তাঁহাকে পাইবার জন্য কবি পথে পথে সকলের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এবং যে যতই বিমুখ হউক বা তাঁহার প্রাণে আঘাত দিক, তিনি সেই পরমপুরুষকে স্মরণ করিয়া—শুধু তাহা সহ্য করা নয়—তাহার প্রতিদানে নিজের প্রাণের গভীর ভালবাসা ঢালিয়াছেন। এই কবিতাটিতে আমাদের দেশের বাউল-বৈরাগীদের ধর্ম্ম-সাধনার তত্ত্ব উঁকি দিতেছে।

ছন্দ—পর্ব্বভাগের ত্রিপদী—৬+৬+৮। ছোট লাইনগুলিতে ছয়মাত্রার দুইটি পর্ব্ব আছে।

৩। **পথের বিরাগী**—ঘরছাড়া উদাসীন ; ভূমিকা দেখ। ৫। **দীঘল**—সংস্কৃত 'দীর্ঘ', বাংলায় এইরূপ হইয়াছে। ৭। নদী ও তটের উপমা ; ৯-১০। আমার প্রাণে যত আঘাত পাই ততই আমার গান আরও মধুর হইয়া উঠে। ১১। **জনম-ভর**—অর্থাৎ জন্ম ভরিয়া, সারাজীবন। ১৩। অর্থাৎ, যে আমার স্নেহের ধন কাড়িয়া লইয়াছে, আমি তাহার স্নেহের ধন হারাইলে আনিয়া দিই। ১৫। **নিঠুরিয়া**—এই 'ইয়া'-প্রত্যয় শব্দটিকে মধুর করিবার জন্য কবিতায় বা গানের ভাষায় এইরূপ রীতি আছে ; বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজবুলিতে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখিবে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **পথের বিরাগী ; দীঘল ; জনম-ভর ; মালঞ্চ।**

(৬৭)

এই কবিতাটির মধ্যে কেবল রচনার নৈপুণ্য নয়,—ভাবের আন্তরিক অনুভূতি আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবে ; এবং ইহাও বুঝিবে যে, কবিতা উৎকৃষ্ট হইতে হইলে, কবির প্রাণের সত্যকার সাড়া তাহাতে থাকা চাই। বর্ত্তমান কবিতাটি কবি কারাগারে অবস্থান-কালে লিখিয়াছেন। যেখান হইতে আকাশ ভাল করিয়া দেখা যায় না, সেই উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কারাগৃহে বসিয়া একদিন শরতের প্রভাতে কবি সেই প্রাচীরের উপরের একটুখানি সূর্য্যালোক দেখিয়া যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই এই কবিতাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, লক্ষ্য কর ; মনে হইবে, তোমরাও যেন সেই কারাগৃহে বসিয়া ঐ সোনার আলো দেখিতেছ।

ছন্দ—ছড়ার ছন্দ—ত্রিপদী, প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া ৪ অক্ষরের (হসন্ত-বাদ) পর্ব্ব আছে, কেবল শেষেরটিতে ৩ অক্ষরের খণ্ডপর্ব্বও আছে। যেমন—

শরৎ রবির্ । সোনার আলো । ঝরিছে (৪+৩+৩)

১১-১২। আমার মতো পিপাসা তোমাদের নাই, তাই মাঠ-ভরা আলোক দেখিয়াও তোমাদের আনন্দ হইবে না কিন্তু এখানে ঐটুকু আলোতেই আমার কি আনন্দ। ১৪। **শ্যাওলা ধরা**—যেমন, 'পোকা-ধরা', 'ছাতা-ধরা' ; এখানে

'ধারার' অর্থ দেখ। ১৯। **দূরের স্বপন** ইত্যাদি—কথাটি চমৎকার। **অর্থ**—পাখীদের পাখা দেখিলে দূর-দূরান্তরে উড়িয়া বেড়ানোর কথা মনে পড়ে, বন্দীর জীবনে তাহার মতো আকাঙ্ক্ষা আর কি আছে? ২১-২৮। বর্ষার জল লাগিয়া প্রাচীরের গায়ে যে-সব দাগ পড়ে, সেগুলিকে যেন কাহারও হাতের আঁকা নানারূপ চিত্র বলিয়া মনে হয়; যেন কাহারা এইরূপ রেখার সাহায্যে কত কথা বলিতে চাহিয়াছিল। আজ আবার তাহারাই শরতের পরিপূর্ণ আনন্দের আবেশে যেন দস্যুর মতো সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বত্র আপনাদিগকে জাহির করিতেছে—দেওয়ালের শেওলা আরও সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, লাল ইঁটগুলোও যেন আরও লাল দেখাইতেছে। কারাগৃহের জানালায় বসিয়া কবি ইহার বেশী কিছু দেখিতে পান না—ঐ ইঁট আর ঐ শেওলা ছাড়া প্রকৃতির শোভা আর কিছুরই মধ্যে দেখিবার উপায় নাই। তবু তাহাতেই কি আনন্দ। ৩৫-৩৬। এই দুই লাইনেই এই কবিতাটির মূল মর্ম্মটি ধরিতে পারিবে। **রঙীন**—ভালবাসার রঙে রঙীন, (এখানে) রৌদ্রে সোনা রং। ৪০। বাক্যটি উপমা মূলক; এইরূপ ভাষা ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী দেখ—'যাহা পূর্ব্বে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না তাহাই ওই আলোর রং মাখিয়া সুন্দর দেখাইতেছে'। ৪৫-৪৮। শেষকয়টি লাইনে, লক্ষ্মী-মেয়ের মতো ঐ আলোর করুণ চোখে কবির বন্দী-জীবনের ব্যথাই কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের প্রাণের যে সহানুভূতি—তাহার বিষয়ে অনেক কবিতা তোমরা পড়িবে; এখানেও সেই সহানুভূতিরই একটি সত্যকার প্রমাণ পাওয়া গেল। মানুষ যখন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার দুঃখ আপনি একা ভোগ করিতে বাধ্য হয় তখন স্নেহময়ী প্রকৃতির করুণ করস্পর্শ তাহাকে বার বার সঞ্জীবিত করে।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা: **মেঘলা দিন; শ্যাওলা ধরা; প্রসাদ; ভুবন-প্লাবিনী; ক্যাকাসে।**

(৬৮)

আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রা শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য নয়—মহাপুরুষের কবর বলিয়া চিরদিন তীর্থস্থানের মতো দর্শনীয় হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের যেমন অশোক, তেমনি মধ্যযুগের ভারতীয় সম্রাটগণের মধ্যে আকবর—ভারতের, তথা

পৃথিবীর, দুই শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ অশোক যেমন প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধীশ্বর এবং অশেষ শক্তিশালী হইয়াও তাঁহার সেই রাজশক্তিকে জনগণের কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—আকবরও তেমনই, প্রায় সমগ্র ভারত এক রাজ্যশাসনের অধীন করিয়া, চিরকালের জন্য এক মহা অনর্থের মূল উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতে এত রাজা এত রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন—এমন মহৎ উদ্দেশ্য আর কাহারও অন্তরে স্থান পায় নাই। এই কবিতায় কবি সেই মহাপুরুষের স্মৃতিমন্দিরে বসিয়া আজিকার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব-সর্বনাশের দিনে আকবরের রাজমহিমা অপেক্ষা সেই অপার মহিমা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন এবং তাঁহার সেই মহামিলন-মন্ত্র আবার ভারতে ঘোষিত হউক এই প্রার্থনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতাটি ইহার সঙ্গে পড়িতে পার।

ছন্দ—পদভাগের ছন্দ;—দুইটি ছোট ও দুইটি বড় চরণের একান্তর (Alternate) মিল—রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতার মতো; প্রথম লাইন—৮ অক্ষর, দ্বিতীয়টি—৬ অক্ষর: যথা—

হে সম্রাট্ বসে আছি | আজি তব সমাধির পাশে (৮+১০)
একান্ত বিজনে (৬)

('কোন দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে,
নাহি জানি আজি'—'শিবাজী')

৯-১০। আকবরের সমাধিস্থানই অতিশয় নির্জ্জন, নিকটে লোকালয় নাই। এইখানে, বর্ত্তমানের কলকোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জন নিস্তব্ধ সমাধিভবনে ছায়াতলে বসিয়া কবি অতীত স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন; ইহার পরবর্ত্তী লাইনগুলিতে সেই ভাব আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা একরূপ ধ্যানের অবস্থা। ১৭-২৪। সম্রাট আকবরের মহা-স্বপ্ন কি ছিল, তাহাই এই কয়টি লাইনে কবি অতিশয় সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তখন হইতেই হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই সবচেয়ে বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। ২৫-৪০। এই কয়টি স্তবকে, বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ-বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কবি তাহার বর্ণনা করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন 'কাহার সন্ধানে'? অর্থাৎ ইহার শেষ কোথায়? ইহার ফলে আমরা কোন্ সদ্গতি লাভ করিব? ৪১-৪৮। যাহারা অতিশয় নিকট জ্ঞাতি বা আত্মীয় তাহাদের মধ্যে এইরূপ বিবাদ ঘটিলে শুধুই

সর্ব্বনাশ নয়, তাহার সঙ্গে আরও এই দুর্গতি হয় যে পরের কাছে আমরা ঘোরতর লজ্জা পাই, এবং আমাদের এই অবস্থায় যাহাদের সুবিধ. হইবে তাহারাও আমাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে না। ৫১। **সাম্যবাদ**—এই শব্দটির আধুনিক অর্থ—ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ভেদ দূর করিয়া সমাজে সকল ব্যক্তির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। সম্রাট্ আকবরের অভিপ্রায় অতিশয় মহৎ হইলেও তিনি যে তাহাতে সাফল্যলাভ করেন নাই, তাহার কারণ, সেই মধ্যযুগের ধর্ম্মসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার তাঁহার পক্ষে এক বিরাট বাধা হইয়াছিল ; আজ মানুষের সে সকল সংস্কার দূর হইতেছে—সাম্যবাদের নূতন নীতি আজ পৃথিবীতে জয়ী হইতে চলিয়াছে, তাই কবি আশা করেন, এতদিনে সম্রাটের প্রাণের কামনা পূর্ণ হইবে। ৫৩। **মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত**—এই সুন্দর বাক্যখণ্ডও রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় আছে ; অর্থ—মন্ত্রের দ্বারা যেমন বিষধর সর্পও বশীভূত হয়।

ভাষা ও শব্দশিক্ষা : **উত্তাল ; স্মৃতির কন্দর ; একনিষ্ঠ ; সৌম্য ; আত্মদ্বন্দ্ব সর্ব্বনাশ ; কম্বুকণ্ঠ ; সাম্যবাদ।**

[দ্রষ্টব্য : কবিতা পাঠের পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে যেটুকু সাহায্য করিব বলিয়াছিলাম তাহার অনেক বেশী করিয়া ফেলিয়াছি ; —অনেক কথাই তোমরা একটু মনোযোগ দিলে বুঝিয়া লইতে পারিতে ; তথাপি, আমি এই কারণে একটু অধিক পরিশ্রম করিলাম যে, তোমরা আমার সঙ্গে এতগুলি কবিতা এমন ভাবে পাঠ করার ফলে, শুধুই কবিতা নয়—ভাষা আরও ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে। ভাষা-শিক্ষার মতো শিক্ষা আর নাই। এইজন্য আমি কবিতার মধ্যে যেখানে যে কথাটি বা শব্দটি একটু বাঁকা ও ভিন্ন ধরণের দেখিয়াছি, সেইখানেই তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। অনেক শব্দ বা খণ্ডবাক্য (phrase) সর্ব্বদা চোখে পড়িলেও তাহাদের মধ্যে যে ভাষা-রীতি বা চলতি-বলির বাঁধন আছে, তাহা তোমরা প্রায় লক্ষ্য কর না এবং সেজন্য নিজেরা লিখিবার সময় ঠিকমত লিখিতেও পার না ; অতএব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবে। 'ভাষা ও শব্দশিক্ষা'র নামে আমি যে সকল শব্দ বা খণ্ডবাক্য তুলিয়া দিয়াছি, তাহার অধিকাংশ তোমাদের খুব পরিচিত হইতে পারে কিন্তু তবু রচনাকালে মনে পড়ে না, কারণ বহুবার পড়িয়া থাকিলেও সেগুলিকে হয়ত তেমন অভ্যাস কর নাই। অতএব ইহাও তোমাদের কাজে লাগিবে। কবিতার মারফতে ভালো ভালো শব্দ

লিখিবার সুবিধা আরও বেশী হয় এইজন্য যে, কবিতার ছন্দে ও ভাষায়, সেগুলি শুনিতে আরও সুন্দর হয়, এবং আবৃত্তি করিয়া পড়িলে সহজেই মনে গাঁথা হইয়া যায়।

অনেক স্থলে আমি যে ব্যাখ্যা দিতেছি, তাহাই হয়ত একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, এমনকি, আমি হয়ত ভুলও করিয়াছি। সে সকল স্থানে তোমরা যদি তোমাদের নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা আরও ভাল অর্থ করিতে পার—তাহা হইলে, আমি খুবই খুশী হইবে। উৎকৃষ্ট কবিতার একটা গুণ এই যে তাহার ভাবার্থ নানা রকমের হইতে পারে; পাঠক আপনার কল্পনা ও আপনার বোধশক্তি অনুসারে যদি তাহার ভিন্ন অর্থ করে, তাহাতে দোষ হয় না; অবশ্য সেই অর্থ দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া চাই—অন্ততঃ সৌন্দর্য্যের হানি না হয়। তোমরাও সেরূপ স্থলে নিজেদের মনোমত করিয়া কবিতার ভাব গ্রহণ করিবে। কিন্তু ছাত্র হইয়া পরীক্ষা দিবার সময়, একটু সাবধান হওয়াই ভাল কারণ সেখানে কেবল নিজের মনোমত হইলেই চলিবে না, উঁদের কাছেও সেই ব্যাখ্যাটি যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই; অর্থাৎ নিজের মতো করিয়া পড়িয়া যতটা বুঝি ও যেটুকু আনন্দ পাই—তাহাই যথার্থ কবিতা পাঠের আনন্দ বটে, তথাপি সেই আনন্দ অপরের কাছে যথেষ্ট নয়; তোমাদের এই আনন্দের কারণটিও ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। যদি তাহা পার তবে তাহার তুল্য গৌরব আর নাই। কিন্তু এখনও তোমাদের সেইরূপ বিদ্যা বা কাব্যে রসবোধ হয় নাই; এজন্য ব্যাখ্যার সময়ে—শুধু ভাব নয় অর্থের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সেই অর্থ, যদি কোনখানে আমার অর্থ অপেক্ষা উত্তম মনে হয়, তবে তাহাই গ্রহণ করিবে, কিন্তু শিক্ষক মহাশয়কেও বিচারের ভার দিবে।

আরও একটি কথা। কবিতা-পাঠের মধ্যে যদি কোথাও বানানের ভুল বা অনিয়ম চোখে পড়ে, তবে তাহাও বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইবে। বার বার অভিধান দেখিবে, এবং ব্যাকরণের নিয়মগুলিও স্মরণ করিবে। কারণ, বানান ভুলের মতো অপরাধ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জ্জনীয়; সকল দেশের শিক্ষিত-সমাজেই বানান-ভুল (এবং উচ্চারণ ভুল) অতিশয় অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ইংরেজী 'Illiterate' এবং আমাদের 'বর্ণজ্ঞানহীন মূর্খ'-একই অর্থের গালি। যে লিখিতে গিয়া বানান ভুল করে, সে যত বড় কবি বা ভাবুক হউক—বিদ্বান নয়, অর্থাৎ সে রীতিমত শিক্ষালাভ করে নাই; কারণ বানান-ভুলের দ্বারাই প্রমাণ হয়—কোন কিছু ভাল করিয়া জানার অভ্যাস তাহার নাই; অতএব সে যাহা লিখে

যাহা বলে, তাহার সম্বন্ধে তাহার নিজেরই কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। বাংলা শব্দের বানান-বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, চলতি বা কথ্যভাষায় কতকগুলি শব্দের বানান এখনও সুনিয়মিত হয় নাই, তাই সেগুলি সম্বন্ধে তোমরা অন্ততঃ সজাগ থাকিবে। বাংলা বানানের গোলযোগ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে তোমরা যদি বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে চাও, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত 'বাঙ্গলা ভাষা ও বানান' নামক বইখানি পড়িয়া দেখিতে পার।

এই পুস্তকের শেষে কবিদের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত; এ বিষয়ে আরও অধিক জানিবার চেষ্টা করিবে। কবিদের জন্ম প্রভৃতির যে তারিখ দিয়াছি তাহা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তোমরা যদি সন্ধান করিয়া এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, তবে এখন হইতে একটু গবেষণার কাজ করিতে শিখিবে—আমাদের দেশে এইটুকু সংগ্রহ করা যে কত দুরূহ তাহা বুঝিতে পারিবে। এইজন্য এই কাজ করার আগ্রহ আরও অধিক হওয়া উচিত।]

শব্দার্থ-সূচী

আর্কফলা—মস্তকের শিখা; টিকি।

আগড়—বেড়া; ঝাঁপ।

আড়ত—বিক্রয়ের জন্য শস্যাদি রাখিবার গোলা।

আদুল—('আদুড়')—অনাবৃত, 'উদলা'।

আলাভোলা—উদাস; এলোমেলো-চেহারা। মূল অর্থ-সাদাসিধা, অচতুর)।

আঁশু—(হিন্দী) অশ্রু।

ইথে—ইহাতে; এইজন্য।

উচল—উচ্চ; উঁচু।

উতরোল—অতিশয় আকুল।

উভরায়—উচ্চরবে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া।

কয়াল—ক্রয়বিক্রয়কালে যে ব্যক্তি দ্রব্যাদি ওজন করে; অতিশয় হিসাবী ব্যক্তি।

কাঁঠি গোল লৌহখণ্ড; মাছ ধরিবার জালে লাগান থাকে।

কুঁদে—কুঁদবার যন্ত্রদ্বারা কাটিয়া।

কোঙর—কুমার; পুত্র।

কোঁড়া—অঙ্কুর।

খেল—খেয়াল; ক্রীড়া।

খাসা—খুব ভাল।

খঞ্জর—(হিন্দী) ছোরা; খঞ্জরী, খঞ্জরধারী।

গোস্তাখী—(ফার্সী) ধৃষ্টতা।

ঘুন্সী—কোমরে বাঁধিবার সুতা।

চাট—মাদক দ্রব্য সেবনকালে ব্যবহৃত মুখরোচক খাদ্য।

চিক—বাঁশের কাঠির দ্বারা তৈয়ারী পর্দ্দা।

চাঙ্গা—সুস্থ; সবল।

ছাদনাতলা—বিবাহের ছায়ামণ্ডপ।

জিন্দা—(হিন্দী) জীবন্ত; অতিশয় শক্তিমান।

ঝিলিমিলি—ঝিকমিকে এবং লম্বমান।

টিপ্—কপালের মধ্যভাগের ফোঁটা।

টোপর—(বিবাহকালে) বরের মাথার মুকুট।

ঠাট—ঢং; ভঙ্গী।

ডগমগ—আবেগে অধীর।

তাড়—বাহুর অলংকার।

দড়—মজবুত; দক্ষ

দিলীর—অসম সাহসী।

দেয়া—মেঘ।

দেয়ালা—শিশুর স্বপ্নের হাসিকান্না ('দেহালা', দিয়ালা')।

দীন্—ধর্ম; ধর্মবিশ্বাস।

দেয়াসী—গ্রাম্য-দেবতার পূজারী; পাণ্ডা।

দোলাই—সূতী কাপড়ের শীতবস্ত্র

ধড়ী (ধুটি); 'বীরধড়া' অর্থে মল্লকচ্ছ বা মালকোঁচা।

ধুকে– অবসন্ন হইয়া।

নয়ালি—বৎসরে নূতন (ধান)।

নাটা—বর্ত্তুলাকার ফলবিশেষ ; করঞ্জা (করমচা)।

নিয়ড়ে—নিকটে ; কাছে।

নেজা—বাঁটুল ; বাণ ; বর্শা।

নাহিয়া—স্নান করিয়া।

নেহাই—নেহাই ; যে লৌহখণ্ডের উপর রাখিয়া কর্ম্মকার লৌহ পিটে।

পাছড়া—উত্তরীয় বস্ত্র ; ওড়না।

পানা—পুকুরের জলের শেওলা।

ফাউড়া—ছোট লাঠি ; ডাণ্ডা।

ফাগ—আবীর।

ফুকো—(ফুৎকার হইতে) অন্তঃসার-শূন্য।

ফেরফার—বিঘ্ন ; বিভ্রাট।

বট—হও ; আছ।

বাড়ে—কিনারায়।

ব্যাজ—কালবিলম্ব।

বুঁদি—বড় আঁটি।

বেশর—নাকের অলঙ্কার।

ভণ্ডন—ভাঁড়ন ; শঠতা।

ভেল—হইল।

মর্দ্দমী—মর্দ্দের ধর্ম্ম ; পৌরুষ।

মস্তানী—উন্মত্ততা ; ('মস্তানা'—মাতাল)

মোলাম—মোলায়েম ; কোমল ; নরম।

মোয়া–খই, মুড়ি, মুড়কি প্রভৃতির তৈয়ারী গোলাকার মিষ্টান্ন। (এখানে) ক্ষুদ্রাকার বস্তু একত্র বাঁধিয়া যে বড় গোলাকার বস্তু হয়।

যিহোবা (Jehovah)—ইহুদীদিগের উপাস্য দেবতা।

যোব (Jove)—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির দেবরাজ।

লোহু—রক্ত।

শমশের—তরবারি।

শাওন—শ্রাবণ।

শশারু—শশক ; খরগোশ।

সাফাই—দোষ ক্ষালন।

সিনান—স্নান।

সেঁউতি—নৌকা হইতে জল সেঁচিবার কাঠের পাত্র।

কবি-পরিচয়

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)—রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বিখ্যাত গীতি-কবি। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'এষা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ; অপর কয়েকখানি কাব্যের নাম 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও 'শঙ্খ'। ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্য শিষ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনের মতো ইঁহার কবিতাও রবীন্দ্র-যুগের গীতি-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। অক্ষয়কুমারের কবিতার প্রধান লক্ষণ দুইটি (১) ভাষার অত্যধিক শব্দ-সংক্ষেপ বা মিতভাষিতা এবং তজ্জন্য ভাবের গাঢ়তা ; তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধিও লক্ষ্যণীয় : (২) আধুনিক গীতি-কবিতার যাহা প্রধান লক্ষণ সেই আত্মভাব-প্রধান কল্পনা বা কল্পনা তন্ময়তা (subjectivity) ; এজন্য তাঁহার কাব্যে বিশেষতঃ 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'তে) একটি অতি মধুর ভাবাবেশ বিহ্বল গীতি-মূর্চ্ছনা আছে—এই সুর তিনি বিহারী-লালের নিকট পাইয়াছিলেন ও তাহাকে স্বকীয় প্রেম-কল্পনায় অধিকতর ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন। [৩৭, ৩৮, ৩৯]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)—নদীয়া জিলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র পুরাতন যুগের শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচনার কোন কোন লক্ষণে, এবং তাঁহার নানা সাহিত্যিক চেষ্টার মধ্যে নূতন যুগের সূচনাও লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং তাহার পরিচালনাসূত্রে সাহিত্যের বহু উপকার করিয়াছিলেন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পরবর্ত্তী যুগের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান কাব্য 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটকাকারে রচিত। 'হিত-প্রভাকর' নামে তিনি গদ্যে ও পদ্যে আরও একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানিরই মূল সংস্কৃত। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার সময়ের বাঙ্গালী-সমাজের বহু বাস্তব চিত্র কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপ, কখনও হাস্যরসমণ্ডিত করিয়া, অতিশয় সহজ ছন্দে ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন ; এইগুলির জন্যই তিনি অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি বহু নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। [১৩, ১৪]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—[খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ] বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার রায়না থানার অধীন দামোদর নদীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম ছিল হৃদয় মিশ্র। স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অত্যাচারে কবি দেশত্যাগ করিয়া আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই আরড়া গ্রাম এক্ষণে মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এইখানে বসিয়া কবি তাঁহার বিখ্যাত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর লেখক হইলেও ('চণ্ডীমঙ্গল' ঐ শতাব্দীর শেষে রচিত), তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য-রচয়িতা; এজন্য তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। গল্প বলিবার শক্তি, হাস্যরস, বাস্তব বর্ণনা এবং চরিত্রাঙ্কন, এই কয়টি বিষয়ে মুকুন্দরাম যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা করিতে হইলে একেবারে ভারতচন্দ্রে আসিতে হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান-শিল্পী; মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকাল-প্রচলিত বাংলা শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ সকল বস্তুর সম্বন্ধে তাঁহার সমান কৌতূহল ছিল এবং তাহাদের যতদূর সম্ভব বিস্তারিত ও যথার্থ বর্ণনাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, সেইজন্য ভাষার সকল শব্দকে কাজে লাগাইতেই হইয়াছে। আরও কারণ, শব্দমাত্রের প্রতিই তাঁহার বোধ হয় একটি মমতা ছিল। ইহার ফলে, আমরা সেকালের বাংলা ভাষার একটি খাঁটি রূপ তাঁহার রচনায় চাক্ষুষ করিতে পারি। এই হিসাবে তাঁহার কাব্যের একটা পৃথক মূল্যও আছে। [৭]

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (জন্ম, আনুমানিক ১৭১৮-২৩ খ্রীঃ)—জাতিতে বৈদ্য, জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী হালিশহরের নিকট কুমারহট্ট গ্রামে—এখন সে স্থানকে হালিশহরই বলে। রামপ্রসাদ তাঁহার কালীবিষয়ক সাধনা-সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। বাংলা ভাষায় এই ধরণের গীত আর নাই ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। এই কবিই (সম্ভবতঃ যৌবনে) দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—একখানি 'বিদ্যাসুন্দর'; এবং অপরখানি কয়েকটি গানের সমষ্টি, তাহার বিষয় গৌরী বা উমার বাল্যলীলা—যদিও তাহা পরে **'কালীকীর্ত্তন'** নামে মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলা-কাব্যের ইতিহাসে

রামপ্রসাদের কাব্য দুইখানির স্থান যেমনই হউক (তাঁহার কাব্য-রচনার শক্তিও অল্প নহে)– ঐ গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। [১২]

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫ খ্রীঃ)—১২৮৪ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ, নদীয়া জিলার শান্তিপুর শহরে জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্র শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কবি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভক্ত করুণানিধানের কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণ ও রূপ চিত্রিত করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া তিনি যেমন নিছক সৌন্দর্য্য-প্রীতির কবি তেমনই ছন্দের অনুযায়ী ভাষা ও ভাবের অনুযায়ী শব্দ-রচনাতেও তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং ভাষার ললিত মধুর ও উদাত্ত-গম্ভীর—দুই সুরের সাধনা করিয়াছেন। তথাপি করুণানিধান বাংলা গীতিকাব্যে যে একটি নূতন ধরণের প্রকৃতি-প্রেম যুক্ত করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা ও কবিত্বের প্রধান নিদর্শন। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির নাম—'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধান-দূর্ব্বা'। [৪৭, ৪৮]

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)—কবির জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার চুরুলিয়া গ্রাম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অতি অল্পবয়সে তিনি 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' নামক বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়া মেসোপটেমিয়া যাত্রা করেন, এবং 'হাবিলদার'-পদ লাভ করেন। যুদ্ধশেষে দেশে ফিরিয়া তিনি 'মোসলেম ভারত' নামক একখানি নূতন সাহিত্য পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। সেই কবিতাগুলির আশ্চর্য্য ছন্দোনৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং ক্রমে তিনি একজন অসাধারণ কবি-বালকরূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করেন—তেমন খ্যাতি ইদানীং আর কোন কবি লাভ করেন নাই। কবি নজরুলের কবিতায় আধুনিক যুব-মনের একটি বিশেষ প্রবৃত্তি – অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের জীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর নানা সংস্কার ও নির্জ্জীব আচারের বন্ধন ছিন্ন করার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা—তাহাই ভেরী-রব অতিশয় দীপ্ত ও অধীর ছন্দে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি এত জনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা আরও একটি উপকার হইয়াছে। তিনি এ যুগের প্রথম মুসলমান কবি, যাঁহার রচনায় সারা বাংলা দেশ সাড়া দিয়াছে, এবং একজন বড় কবি বলিয়া যাঁহার

খ্যাতি রটিয়াছে ; ইহার ফলে বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার উৎসাহ এবং তাহাতে গৌরববোধ জাগিয়াছে ; কবি নজরুল ইসলাম যেন একটি আত্মবিস্মৃত সমাজকে নিজের শক্তি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—শেষের দিকে তিনি অজস্র গান রচনা করিয়াছেন—সেই গানগুলিতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নজরুলের বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা', 'সিন্দুহিল্লোল', 'ছায়া', 'বুলবুল'। [৬১, ৬৩, ৬৪]

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)—বরিশাল জিলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে জন্ম। বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও সেসন্স জজ কেদারনাথ রায়ের পত্নী। বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপরগুলির নাম—'নির্ম্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি। কবিত্বের পরিচয় 'কবিতা-পাঠ'-এর প্রসঙ্গে পাইবে। [৩২, ৩৩, ৩৪]

কালিদাস রায় [কবিশেখর] (১৮৮৯)—১২৯৫ সালের আষাঢ় মাসে রাঢ়ীয় বৈদ্য বংশে বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ। কবিত্বের পরিচয় 'কবিতা-পাঠে'র যথাস্থানে পাইবে। ইনি 'কুন্দ', 'কিশলয়', 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'ঋতুমঙ্গল', 'রসকদম্ব', 'বৈকালী' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। [৬০, ৬১]

কাশীরাম দাস (খ্রীঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)—ইঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বাঙ্গালীর 'মহাভারত'। কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রাম। ইনি দেব-উপাধিক কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। [৮]

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২)—বর্দ্ধমান জিলার 'উজানী' গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম হয়। ইনি দীর্ঘকাল মাথরুণ (বর্দ্ধমান জিলা) উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কবি হিসাবে ইঁহাকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের আধুনিক বংশধর বলা যাইতে পারে—ইঁহার মন-প্রাণ সেই প্রেম ও ভক্তিরসে পূর্ণ। কবি কুমুদরঞ্জন পুরা রবীন্দ্র-যুগের কবি হইলেও, এবং

তাঁহার কবিতার ভাষায়.ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ প্রভাব লক্ষিত হইলেও তিনিই বোধ হয় তাঁহার সমকালীন কবিগণের মধ্যে কাব্যের ভাববস্তু ও প্রেরণার বিষয়ে, সর্ব্বাপেক্ষা সেই প্রভাবের বাহিরে থাকিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের সমকক্ষ। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী সাধক-কবিগণের যে গান, ভাবের সরলতায় ও প্রাণের আকুলতায়, মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিত—সেই গানই যেন কুমুদরঞ্জনের রচনায়, ভাব ও বিষয়-বৈচিত্র্যে, ছন্দে ও উপমা-অলঙ্কারে, কবিতার আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার প্রধান লক্ষণ তিনটি—(১) অতিশয় সরল অথচ চমকপূর্ণ ক্ষিপ্র-গভীর অনুভূতি, এইজন্য তাঁহার কবিতাগুলিতে ভাবের একাগ্রতা যেমন, কল্পনার বিস্তার তেমন নয়—খাঁটি গীতি-কবিতার মতো তাহারা একটিমাত্র ভাবের উৎসারে নিঃশেষ হইয়া থাকে। (২) তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সর্ব্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল হইয়া উঠে। দুঃখেও কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহ নাই ; যাহা অতি তুচ্ছ ও সুলভ—তাহাও তাঁহার কল্পনায় হাসি-অশ্রুর অপূর্ব্ব উৎস হইয়া উঠে। ইহার মূলে আছে—বাঙ্গালীর জাতিগত একটি বিশিষ্ট কালচার (culture) বা চিত্তোৎকর্ষ—বৈষ্ণব-সাধনার প্রভাব। এই হিসাবে কুমুদরঞ্জনের কবিতা এক শ্রেণীর খাঁটি বাংলা কবিতা। কুমুদরঞ্জন বাংলার পল্লীকেই তীর্থ মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন ; এজন্য তাঁহার কবিতাকে খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের উৎসার বলা যাইতে পারে। (৩) তাঁহার ভাবপ্রকাশের প্রায় একমাত্র ভাষা—উপমা ; এই উপমা ; তাঁহার কবিতার কেবল অলঙ্কারই নয়, উহাই তাঁহার হৃদয়ের অতি গভীর ও অকপট অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র উপায় ; উহার মধ্যে তাঁহার কাব্যের যত-কিছু কৌশল ও কবিত্বশক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি 'অজয়', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনতুলসী', 'বনমল্লিকা', প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন; কাব্যগুলির নামেও তাঁহার বিশিষ্ট কবিভাবের পরিচয় রহিয়াছে। [৫৫, ৫৬]

কৃত্তিবাস ওঝা (খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী)—জন্ম-তারিখ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। ইনি নদীয়া জিলায় অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষে জন্মগ্রহণ করেন। মুখুটি-বংশীয় ব্রাহ্মণ—উপাধি ওঝা, অর্থাৎ উপাধ্যায়। অনেকের মতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর দনুজমর্দ্দন গণেশের আদেশক্রমে তাঁহার অমরকীর্ত্তি 'রামায়ণ' অনুবাদ করেন। এই 'রামায়ণ'-এর ভাষায় বহু পরিবর্ত্তন হইয়া এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাসের নিজের ভাষা

কতখানি আছে বলা কঠিন-তথাপি 'ইহাই কৃত্তিবাসের কবিত্বের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ('কবিতা-পাঠ' দেখ.)। [৪]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (১৮৩৮-১৯০৭)—বাংলা ১২৪৫ সালে খুলনা জেলায় সেনহাটি গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই দুই সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—বিশেষ করিয়া পারস্য-কবি শেখ সাদীর ভাব তাঁহার রচনার বহুস্থলে আছে। 'সদ্ভাব শতক'ই ইঁহার একমাত্র প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। কবি যশোহর জেলার এক স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন; তিনি কয়েকখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। [২৮]

গোবিন্দচন্দ্র দাস—(১৮৫৫—১৯১৮)—ঢাকা জিলার ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি, এবং তাঁহার কালে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে বাংলা ১২৬১ সালের ৪ঠা মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক আধুনিক কবিগণের তুলনায় গোবিন্দদাস তেমন শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার রচনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট অঙ্কিত,এবং ভাষায় ও কল্পনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে। তাঁহার কল্পনার প্রসার বড় অল্প ছিল—কিন্তু ভাবের একাগ্রতা বা অনুভূতির তীব্রতা কিছু অধিক ছিল। তিনি যে সত্যকার স্বভাব-কবি ছিলেন,তাহার আর এক প্রমাণ—তাঁহার জীবন; সামাজিক বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার অভাবে এবং অতিশয় উদ্দাম ভাবপ্রবণ হওয়ায়, তিনি জীবনে বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন – শুধু শোক-তাপ ও দারিদ্র্য-দুঃখই নয়,তাঁহাকে দারুণ উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলিই প্রধান—'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'প্রেম ও ফুল', 'বৈজয়ন্তী' ('কবিতা-পাঠ')। [৩১]

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)—বরিশাল জিলার মীরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাসী ছিলেন। ইঁহার কবি-খ্যাতি কিছু বিচিত্র বলিতে হইবে, কারণ ইঁহার কেবল দুইটিমাত্র কবিতা বাংলা ভাষায় অমর হইয়া আছে—'কতকাল পরে বল ভারত রে' এবং 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও' (২৬)। তাহাতেই কবি অমর হইয়াছেন; এমন ভাগ্য অল্প কবির হয়। ইঁহার কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটি প্রায় প্রবাদ বাক্য হইয়াছে—"পর দীপ-শিখা নগরে নগরে। তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" [৩০]

চণ্ডীদাস (ষোড়শ শতাব্দী)—প্রাচীন বাংলার আদি গীতি-কবির নাম বড় চণ্ডীদাস—ইঁহার জীবিতকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই চণ্ডীদাস ছাড়াও একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে যে কাব্যখানি পাওয়া গিয়াছে —পরবর্ত্তীকালের চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি তাহারই অনুকৃতি, কিংবা তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া পৃথক গীত-রচনা হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত আদৌ বিচারসহ নয়। তাহার প্রধান কারণ, এ বিষয়ে সামান্য কিছু প্রমাণ থাকিলেও—বাকি সবটাই অনুমান। বাংলা-সাহিত্য ও বাংলা কাব্যের অনুরাগী বাঙ্গালী পাঠক এবং নবশিক্ষার্থী ছাত্রগণের পক্ষে ইহাই জানিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি ছিলেন; তাঁহাদের একই নামের ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যেগুলি কীর্ত্তনীয়াদের কণ্ঠে নানা ভঙ্গীতে নানা আখর যুক্ত হইয়া বাঙ্গালীকে এতকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই পদগুলির রচয়িতা যিনি—সেই কবি চণ্ডীদাস ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত পদকর্ত্তাগণেরই একজন। আদি চণ্ডীদাস যে সত্যই বাংলার আদি কবি তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব গীতিকাব্য যে তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণ করিয়াছে—ইতিমধ্যে আর কোন ভাব-তরঙ্গ বা অভিনব কাব্য-প্রেরণার কারণ ঘটে নাই, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর প্রাণ-মনের একটি গভীরতম ও সর্ব্বাঙ্গীণ জাগৃতি ঘটে নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত; অতএব এই শতাব্দীতে চণ্ডীদাস নামে অপর একজন উৎকৃষ্ট কবির আবির্ভাব আদৌ অসম্ভব নহে। সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে ঐ 'চণ্ডীদাস' নামটিতে। চণ্ডীদাস ভণিতার অনেক উৎকৃষ্ট পদ এখন অন্য কবির রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে; তৎসত্ত্বেও বাকি পদগুলির মধ্যে যেগুলি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট, সেগুলির কবি যে একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চণ্ডীদাসকে অধুনা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে পৃথক চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং ইনিই চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত প্রায় সকল উৎকৃষ্ট-পদের রচয়িতা। [৫]

জসীম উদ্দীন (১৯০৩)—কবি লিখিয়াছেন- তাঁহার জন্মস্থান তাম্বুল-খানা—ফরিদপুর শহর হইতে ১৬ মাইল দূরে একখানা জঙ্গলপূর্ণ গ্রাম। পৈতৃক বাসস্থান উক্ত জিলার গোবিন্দপুর গ্রাম। তিনি বাংলার পল্লীজীবন ও পল্লী-প্রকৃতির সহিত মনে-প্রাণে এমনভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে, উচ্চশিক্ষা

(এম. এ. ডিগ্রী) লাভ করিয়া অথবা বিদ্বান-সমাজে বাস করিয়াও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে) তিনি তাঁহার সেই আজন্ম পল্লী-প্রেম এবং পল্লী-জীবনের সংস্কার কিছুমাত্র ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে এমন পল্লী-প্রেমিক কবি আর কেহ নাই, তাই তিনি, শিক্ষিত সমাজের মনোভাব বা উচ্চতর সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না; বাংলার—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের—মুসলমান চাষী- সমাজের জীবন-যাত্রা তাঁহাকে যেরূপ মুগ্ধ করে—তাহাদের নিজেদেরই রচিত ভাটিয়াল, জারী, মুর্শিদা প্রভৃতি গান, তাঁহার হৃদয় যেরূপ বিগলিত করে, তাহাতে তিনি বাংলার ঐ জীবন এবং ঐ সমাজকেই মানুষমাত্রের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং নিজেকেও তাহাদের একজন মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। এরূপ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে বলিয়াই কবি জসীম উদ্দীন এমন সুন্দর পল্লীগীতি রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় আমরা বাঙ্গালী-জীবনের একটা অবজ্ঞাত দিক এবং তাঁহার কবিতায় মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়া বড় উপকৃত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত কবি এই কয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছেন—'রাখালী', 'বালুচর'', 'ধানক্ষেত', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। তাঁহার 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এর—"The Field of the Embroidered Quilt" নামে ইংরাজীঅনুবাদ হইয়াছে।

[৬৫, ৬৬]

জ্ঞানদাস (ষোড়শ শতাব্দী)—শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগরে অন্যতম। প্রাচীন বর্দ্ধমান জিলার কাঁদড়া (কান্দুরা) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ব্রজবুলি' ভাষায় বহু পদ রচনা করিলেও ইঁহার বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। এই পদগুলির গভীর আন্তরিকতা, ভাবের স্বাভাবিকতা এবং ভাষার গাঢ় অথচ সহজ ভঙ্গির গুণে ইনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। [৬]

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৪-১৯২০)--ইঁহার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ সেন হুগলী জিলার বলাগড় গ্রামের মজুমদার উপাধিক এক সুপ্রাচীন বৈদ্যবংশোদ্ভূত মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশত্যাগ করিয়া বিহারের গাজীপুর শহরে গিয়া বসবাস-কালে খেতাব-উপাধি (মজুমদার) ত্যাগ করিয়া বংশের সেন (সেনগুপ্ত) উপাধি গ্রহণ করেন। তথায় তিনি নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীলাভ করিতে পারেন নাই; ইহার কারণ, সাহস ও কর্ম্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি

অতিশয় সৌখিন ও মুক্তহস্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মাতাও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ছিলেন; তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন তেমন তাঁহার মনের শক্তিও ছিল অসাধারণ; তদুপরি প্রখর আত্মসম্মানবোধ ছিল। ইহার বলে, স্বামীর মৃত্যুর পর দুরবস্থায় পড়িয়াও তিনি পাঁচটি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই জ্যেষ্ঠ, অপর সহোদরগণও সকলেই বিদ্বান ও কৃতী হইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। ইনিও 'বড়-দাদার' ভক্তশিষ্য ও সুকবি। দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ গাজীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা বিহার ত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষ্যে যুক্ত-প্রদেশের একাধিক স্থানে বাস করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে এলাহাবাদই প্রধান, দেবেন্দ্রনাথ এখানেই ওকালতী করিতেন। তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন, পরে এম. এ. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে নানা বিপর্য্যয় ও অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি শেষ জীবনে দেরাদুনে বাস করিয়াছিলেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় 'শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা', নামক বিখ্যাত বৃহৎ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্পর্কে বাংলার রাজধানীতে তিনি যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তখনও বিষয়-কর্ম্ম অপেক্ষা কাব্যের উন্মাদনা ও সাহিত্যিক বন্ধুদিগের সহিত আলাপ আলোচনাতেই অধিকাংশ সময় কাটিত। আধুনিক গীতি-কবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের একটি অতি উচ্চস্থান আছে। উচ্চ-শিক্ষার সহিত স্বাভাবিক কবিপ্রতিভা যুক্ত হইলে যাহা হয়, দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে তাহাই হইয়াছে। তাঁহার কবিতার ভাষায়, ভাবে ও ছন্দে এমন একটা প্রকৃতির পরিচয় আছে যাহা অতিশয় মৌলিক। তিনি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন; শেষে সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কয়েকভাগে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে তাহা সুপ্রচারিত হয় নাই। তাঁহার কাব্য সংগ্রহের মধ্যে—'অশোক-গুচ্ছ'ই (প্রথম সংস্করণ) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্যগুলির নাম—'পারিজাত-গুচ্ছ', 'শেফালী-গুচ্ছ' 'অপূর্ব্ব বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি। [৩৫, ৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)—বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণ কুলে এক অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন; এবং সেকালের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে চরিত্র এবং বিদ্যার গুণে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বাংলা ১২৮১ সালে এম. এ. পাস

করার পর স্টেট স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন ; পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তি বাল্য হইতেই উন্মেষ লাভ করিয়াছিল। প্রথমে তিনি তাঁহার কয়েকটি ইংরেজী কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেগুলিতে তাঁহার গভীর স্বদেশীপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়. ইহার পরে, তিনি 'হাসির গান' ও কয়েকটি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করিয়া অতি সত্বর খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার হাস্যরসের রচনাগুলিতে এমন একটি নূতন সুর ও ভঙ্গি আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বে বা পরে আর দেখা যায় নাই - সেই হাসির গানগুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', ও 'আষাঢ়ে' এই তিনখানি কাব্যে তিনি যে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতেও একটি নিজস্ব ভাব ও ভঙ্গি আছে। শেষের দিকে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর চরিত্র উন্নত এবং তাহাদের মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতি গৌরব জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন - সেগুলি সেকালে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল ; ইহাদের মধ্যে—'দুর্গাদাস', 'রাণাপ্রতাপ,' 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মেবার পতন'—উল্লেখযোগ্য। [৪৪, ৪৫]

নবীনচন্দ্র সেন—(১৮৪৬-১৯০৯) বাংলা ১২৫৩ সালে চট্টগ্রাম জিলার নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম হয়। ১৩৬৮ সালে বি. এ. পাস করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। নবীনচন্দ্র নূতন যুগের ('পরিবর্তন-যুগ'—এর ভূমিকা দেখ) মহাকবিগণের অন্যতম। তাঁহার কবিতায় ভাব ও ভাবুকতার একটা গভীর ও উন্নত আদর্শ-রক্ষার প্রয়াস আছে। তাঁহার কল্পনাশক্তি – বিশেষতঃ গল্প-রচনার শক্তি—কিছু অবাধ ও স্বাধীন ছিল, ভাবের উচ্ছ্বাসেও একটা বাড়াবাড়ি ছিল ; তথাপি তাঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, এবং ছন্দও মধুর-গভীর। একদিকে অবাধ কল্পনা ও ভাবের কিঞ্চিৎ আধিক্য, অপরদিকে, সর্বত্র জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ-প্রচার —তাঁহার কাব্যগুলিকে এক সময়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের নিকট বড়ই উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিল। একজন মহাপণ্ডিত তাঁহার—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'—এই তিনখানি কাব্যকে উনবিংশ শতাব্দীর 'মহাভারত' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র শেষে কাব্য-সাহিত্য হইতে ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি উৎকৃষ্ট রচনা ; ইহার প্রবল কবিত্ব ও রচনার নূতন ভঙ্গি সকলকে মুগ্ধ

করিয়াছিল—এই কাব্যের দ্বারাই তিনি সাধারণের মধ্যে কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'অবকাশ-রঙ্গিনী' নামে তিনি যে খণ্ড কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন প্রায় অপাঠ্য বলিলেই হয়। [২৯]

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৪—)—রবীন্দ্রযুগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কবিগণের মধ্যে প্রভাতমোহন একটি বিশিষ্ট স্থান দাবী করিতে পারেন। পৈতৃক নিবাস হুগলী জিলায়। ইঁহার জননী পরলোকগতা ইন্দিরা দেবী (৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং অনুরূপা দেবীর ভগিনী) এককালে গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রভাতমোহন অতি অল্প-বয়সেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পরে 'বিশ্বভারতী' বিদ্যাপীঠে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা করেন, এবং উদীয়মান চিত্রশিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শেষে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া, চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। বর্ত্তমানে তিনি সম্পূর্ণ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা জাতীয় আদর্শের শিক্ষাশ্রম পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'মুক্তি-পথে' সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। (কাব্যসমালোচনা 'কবিতা-পাঠ' প্রসঙ্গে যথাস্থানে দেখ।) [৬৭]

বিদ্যাপতি (১৪শ-১৫শ শতাব্দী)—মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। ইনি চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভাষার কবি হইলেও বাঙ্গালীই ইঁহার কাব্য হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া ইঁহার কবিতা ও কবিতার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে আদর্শ করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এই কারণে বিদ্যাপতি মৈথিল হইলেও বাঙ্গালী কবি হইয়া গিয়াছেন। তিনি পদাবলী ছাড়াও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পদগুলির ভাবা ও ছন্দ যেমন জমকালো তেমনই খাঁটি কাব্য-হিসাবে তাঁহার রচনার একটি বিশেষ মূল্য আছে। [১, ২, ৩]

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৪-১৮৯৪)—কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্ম হয়। 'সারদামঙ্গল' কাব্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য; অপর কাব্যগুলির মধ্যে 'সাধের আসন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', ও 'প্রেম-প্রবাহিনী' প্রধান। বিহারীলাল জীবিতকালে কবি-যশ লাভ করিতে পারেন নাই; তাহার কারণ তাঁহার সময়ে নূতন গীতি-কবিতার সুর কেহ বুঝিত না এবং তখন মহাকাব্যেরই

বিশেষ আদর ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণের দ্বারা যখন নূতন গীতি-কবিতায় অপূর্ব্ব রূপ—ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে—প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেখা গেল, কবিতার এই নূতন আদর্শ ও নূতন ভঙ্গি বিহারীলাল হইতেই সুরু হইয়াছে, এবং তাঁহার কবিতার মধ্যে ভাবের যে সূক্ষ্ম বীজটি ছিল—পরবর্ত্তীগণের কবিতায় তাহাই নানারূপে বিকশিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য বিহারীলালকেই নব্য গীতি-কবিতার প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে; এবং সেই হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটি অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ('কবিতা-পাঠ' দেখ)। [২২, ২৩]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী যশোহর জিলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। ১২।১৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া পিতার খিদিরপুরের বাড়ীতে থাকিয়া হিন্দু কলেজে সিনিয়র ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং তাহার পর হিন্দু-কলেজ ছাড়িয়া বিসপ্‌স কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ গমন করেন এবং তথায় জীবিকার জন্য শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐখানে অবস্থানকালে তিনি তথাকার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষের কন্যা শ্রীমতী হেনরিয়েটার পাণিগ্রহণ করেন,—ইংরেজী কবিতা লিখিয়া ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর পিতার মৃত্যুর পর দেশে ফিরিয়া তিনি সেকালের সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলেন এবং বাংলা-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটক, কবিতা ও মহাকাব্য লিখিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ড গমন করিয়া এবং তথায় ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ব্যারিস্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত ব্যয় ও অমিতাচারের ফল ঋণগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করেন। মধুসূদনের 'Captive Lady" 'Visions of the Past'—প্রথম রচনা, দুইখানি কাব্যই ইংরেজী। বাংলা ভাষায় তিনি প্রথম নাটক রচনা করেন এবং পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার

তিনখানি উৎকৃষ্ট কাব্য—'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা', ও 'বীরাঙ্গনা'—প্রকাশিত হয়। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র অধিকাংশ রচনা করেন।

মধুসূদন আধুনিক সাহিত্যের পত্তনকারীদের অন্যতম এবং কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয়। মাত্র চারি বৎসর লেখনী ধারণ করিয়া আর কোন দেশের কোন কবি এইরূপ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তিনি যখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সে ভাষায় তাঁহার অধিকার অল্পই ছিল—বাল্যে পাঠশালায় যেটুকুও পরিচয় এবং মাতৃভাষা বলিয়াই যেটুকু জ্ঞান, তাহার অধিক ছিল না; এবং সেটুকুও বহুদিন বিদেশে বাস, ও বিজাতীয় সমাজে বিদেশী সাহিত্য চর্চ্চার ফলে মলিন হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় লেখনী ধারণের দুই বৎসরের মধ্যে 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা'র মতো কাব্য রচনা করিতে পারা যথার্থ দৈবী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, প্রথম—ঐরূপ প্রতিভা; দ্বিতীয়—ভাষামাত্রই আয়ত্ত করিবার তাঁহার আশ্চার্য্য ক্ষমতা। মধুসূদন যতগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন—সেকালে ভারতবর্ষে আর কেহ ততগুলি ভাষা জানিতেন না। তিনি বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া এই ভাষাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন—সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও ইতালীয়ান। এইরূপ স্বগৃহে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষায় কথা কহিতেন। শেষ জীবনে বহু ভাষায় বিবিধ উৎকৃষ্ট কাব্যের সহিত পরিচয় থাকার জন্য এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট কবি প্রতিভা যুক্ত হওয়ায়, তিনি যেন ইচ্ছামাত্রেই বাংলা কাব্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন—নূতন কল্পনা, ভাষা ও নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলেন। মধুসূদন নাটক-রচনাতেও নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতাই প্রথম বাংলা সনেট। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে যে তিনটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উদয় হইয়াছে তাহাদের মধ্যে মধুসূদন অন্যতম; বলা বাহুল্য, অপর দুইজন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। [১৮, ১৯, ২০, ২১]

মানকুমারী বসু (১৮৬৫-১৯৫৪)—যশোহর জিলার শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীর কন্যা। মানকুমারীর পিত্রালয় ঐ জেলায় কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী আর এক

গ্রামের বসু-পরিবারে মানকুমারীর বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র। অতিশয় বাল্যকালেই তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; শ্বশুরালয়েও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল, তাই সেখানেও তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ও সাহিত্য-চর্চ্চার কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। ১৪ বৎসর বয়সে রচিত তাঁহার একটি কবিতা তখনকার বিখ্যাত 'সংবাদ-প্রভাকর, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তাঁহার প্রথম পুস্তক 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পরে তিনি কবি-খ্যাতি লাভ করেন। পরে 'কনকাঞ্জলি' ও 'বীরকুমার বধ' নামে তিনি আরও দুইখানি কাব্য রচনা করেন। কবি মানকুমারী আধুনিক যুগের কবি হইলেও তিনি রবীন্দ্র-যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহার কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব কিছু আছে; তথাপি ভাবের আন্তরিকতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, এবং সাধারণ সামাজিক জীবনের উপযোগী ভাবচিন্তার গুণে তিনি বাংলার মহিলা-কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছেন। [৪৬]

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)—বাংলা ১২৯৫ সালে (১১ই কার্ত্তিক) নদীয়া জিলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বৈদ্যবংশে জন্ম; পৈতৃক নিবাস হুগলী জিলার বলাগড় গ্রামে। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার, মাতার নাম হেমমালা দেবী। পিতা ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতিভ্রাতা —দেবেন্দ্রনাথের পিতারও পূর্ব্ব উপাধি ছিল 'মজুমদার'। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বংশও তাঁহার মাতুল-বংশেরই এক শাখা। মোহিতলালের কৈশোর ও স্কুল-জীবন বলাগড় গ্রামেই অতিবাহিত হয়; বাল্যে কিছুদিন কাঁচরাপাড়ার নিকটবর্ত্তী হালিশহরে মায়ের মাতুলালয়ে থাকিয়া তথাকার স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিতলালের যে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়, তাহা এই: স্কুলের ও কলেজের (তিনি তখনকার 'মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন্' ও এখনকার 'বিদ্যাসাগর কলেজ' হইতে ১৯০১ সালে বি. এ. পাস করেন) শিক্ষা তিনি সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মানব প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধনপন্থার নির্দ্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ এবং পিতার কবি-স্বভাব ও কাব্য-প্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। কাব্য-সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী।

[মোহিতলালের কবি-খ্যাতি সাহিত্য-সমাজেই সীমাবদ্ধ—সেখানেও তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষা এমনই গুরু ও গম্ভীর যে তরল-মতি তরুণ অথবা সৌখিন-হৃদয় বৃদ্ধ কাহারও পক্ষে তাহা সুখসেব্য নহে। তৎসত্ত্বেও, আধুনিক কবিগণের মধ্যে তাঁহাকে একটা স্থান দেওয়া চাই না হইলে নাকি অন্যায় করা হইবে।] মোহিতলাল এ পর্য্যন্ত এই কয়খানি কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন—'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত গোধূলি'। [৫৯]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)—১২৯৪ বঙ্গাব্দে, আষাঢ় মাসে বর্দ্ধমান জিলার পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম হয়; নিবাস শান্তিপুরের নিকট হরিপুর গ্রাম। পিতার নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। যতীন্দ্রনাথ এফ. এ. পাস করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে ১৯১১ সালে বি. ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল কৃষ্ণনগরে ডিস্ট্রিক বোর্ডের অধীনে চাকুরী করিয়া পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া কাশিমবাজার এস্টেটে কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা' রচিত ও প্রকাশিত হয়। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের কথা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন বাল্যে ও কৈশোরে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও পাঠ্য-পুস্তকের কবিতা ভিন্ন তিনি আর কোন কাব্য-পাঠের সুযোগ পান নাই; ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সহিত পরিচয় ও তাঁহার সহানুভূতি ও উৎসাহের ফলে, তিনি রীতিমত কবিতা লিখা আরম্ভ করেন। যতীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এই ইতিহাস তাঁহার কবিতার ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বুঝিবার পক্ষে মূল্যহীন নহে। কবি আরও লিখিয়াছেন, "আমার কাব্যের দুঃখবাদ পারিবারিক জীবনের দুঃখ হইতে উদ্ভূত নহে; এ ভূত কোথা হইতে ঘাড়ে চাপিল জানি না—প্রথম কৈশোর হইতেই সে আমার পিছু লইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।" আধুনিক কবিগণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন; তাঁহার কবিতায় ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা এবং তীব্র অনুভূতির সহিত আত্মস্থতা অতিশয় লক্ষ্যণীয়। যতীন্দ্রনাথের কর্ম্ম-জীবনে ও কবি জীবনে সাক্ষাৎ বিরোধ আছে মনে করিয়া কৌতুক বোধ হয়। তিনি বি. ই. উপাধিধারী ইঞ্জিনিয়ার,

আর কোনও বাঙ্গালী বোধ হয় ঐরূপ শিক্ষা ঐরূপ কর্ম্মজীবন সত্ত্বেও এমন কবি-প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। কর্ম্মকার যেমন অতি কঠিন লৌহ আগুনে কোমল করিয়া তাহার সেই অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ পিণ্ডকে হাতুড়ির আঘাতে নানা আকারের গঠন দেয়—যতীন্দ্রনাথের কবিতায় অগ্নিতপ্ত হৃৎপিণ্ডের উপরে সেই হাতুড়ির আঘাত এবং তাহার ফলে ভাব ভাষার জমাট দৃঢ়তা ও সুপরিচ্ছন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। (কবিত্ব সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠ'-এর যথাস্থানে দেখ)। যতীন্দ্রনাথ এই কয়খানি কাব্য রচনা করিয়াছেন—'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', এবং 'সায়ম'। [৫৬-৫৭]

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)—নদীয়া জিলার জমশেরপুরের সম্ভ্রান্ত বাগচী পরিবারে সন ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺হরিমোহন বাগচী। অতি অল্পবয়সেই যতীন্দ্রমোহন কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—ছাত্রাবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার কবিতা সেকালের 'ভারত', 'সাহিত্য' প্রভৃতি বড় বড় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা লেখার বিরাম ছিল না। তিনি অধুনালুপ্ত 'মানসী' ও 'যমুনা' এই দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, এইজন্য তাঁহার কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার বিশুদ্ধা ও মাধুর্য্য, খাঁটি বাংলা-বুলির ব্যবহারে কবিজনসুলভ নৈপুণ্য—ইঁহার রচনার একটি বিশেষ গুণ। কবিত্বের প্রধান লক্ষণ—সহৃদয়তা; অতিশয় সামান্য বাঙ্গালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, এবং বাংলার পল্লী-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ইঁহার কবিতায় যেমন মধুর, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে; এই বাস্তবপ্রীতির সঙ্গে কবি কল্পনার সৌকুমার্য্যও তাঁহার কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার ভাষা ও ভাব যেমন পল্লীবাসী খাঁটি বাঙ্গালীর ভাবনা ও কল্পনায় সঞ্জীবিত, তেমনই উৎকৃষ্ট রুচি ও রসবোধের দ্বারা সংযত ও সুমার্জ্জিত। ইঁহার রচিত কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান—'রেখা', 'লেখা', 'অপরাজিতা', 'জাগরণী', 'নাগকেশর', 'নীহারিকা', 'মহাভারত' ও 'পাঞ্চজন্য'। [৪৯, ৫০]

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭)—হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম হয়। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল অতিশয়

সুপণ্ডিত ছিলেন—অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অল্প বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকর পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। রঙ্গলাল আধুনিক ও প্রাচীন কবিগণের মধ্যবর্ত্তী—তাঁহার বিখ্যাত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে এ দুই যুগের চিহ্নই বর্ত্তমান এবং তাহাতে কাব্যের আধুনিক লক্ষণ—ইংরেজী কাব্যের প্রভাব—প্রথম প্রকাশ পায়; তথাপি রঙ্গলাল অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন; তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই বাংলা কবিতার উন্নতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল—সেকালের কদর্য্য রুচি, গ্রাম্য ভাব ও অমার্জ্জিত ভাষা হইতে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তোলা। এই কার্য্যে তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত আধুনিক আদর্শে বাংলা কবিতাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য কয়েকখানি কাব্যের নাম—'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী', 'কাঞ্চী কাবেরী' (কবিত্ব সম্বন্ধে 'কবিতা-পাঠ' দেখ)।

[১৫, ১৬, ১৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর-বংশে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে জন্ম হয়; পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। ১৭ বৎসর বয়সে শিক্ষা-লাভের জন্য প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে 'ভারতী' পত্রিকার বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইহার পর সারা-জীবন ধরিয়া ক্রমাগত কাব্য, নাটক নভেল প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৯১ সালে বিখ্যাত মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশ করেন এবং নব পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক হন। ১৯০২ সালে স্ত্রী বিয়োগ হয়। ১৯১২ সালে কবির বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' এক বিরাট সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন এবং এই বৎসর তিনি তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৯১৩ সালে 'নোবেল প্রাইজ' পান। ১৯১৪ সালে 'নাইট' পদবী লাভ করেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ-স্বরূপ 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে সমগ্র ইউরোপ পর্য্যটন করেন এবং সর্ব্বত্র অসাধারণ সম্মান লাভ

করেন। ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' ও পর বৎসর 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন; ১৯৩০ সালে একদশতম বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হন ও ইউরোপে নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বহির্ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্য্যটন করিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে কোন কোন দেশে একাধিকবার গমন করেন। ১৯৩০ সালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর পূর্ণ হইলে পৃথিবীর সকল দেশের মনীষিগণ তাঁহাকে আনন্দ ও সম্মান-জ্ঞাপন করেন এবং সেই উপলক্ষে কলিকাতায় তাঁহার 'জয়ন্তী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃ শি . রষৎ তাঁহাকে 'কবি সর্ব্বভৌম' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯৩২ .লে তিনি পারস্যের সম্রাটের নিমন্ত্রণে আকাশযানে পারস্যে গিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট কিঞ্চিদূর্দ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে কবি পরলোক গমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ভারতের মহাকবিগণের অন্যতম। বাল্মীকি, ব্যাস এবং কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে চতুর্থ আর কোন কবি তাঁহার সমকক্ষ নহেন; এমন বলাও যাইতে পারে, গীতি-কবি হিসাবে তিনি এদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সকল কবির শীর্ষস্থানীয়। আরও একটি বিষয়ে তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ—তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের সাধনাকে কাব্যের ভিতর দিয়া এক অখণ্ডরূপে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সেই সাধনায় মানবাত্মার যে অত্যুচ্চ ধারণা নিহিত ছিল তাহারই প্রেরণায় তিনি আধুনিক যুগে সর্ব্বজাতির—সর্ব্বমানবের—মহামিলন গান গাহিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার রচনাবলীতে বিশ্বজনীতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় ভাব-চিন্তার যাহা কিছু সত্য, সুন্দর ও সঞ্জীবন, তাহাকেও তিনি খাঁটি ভারতীয় ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট মিলনভূমি হইয়া আছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। তিনি বাংলা-ভাষা ও বাংলা ছন্দকে এত রূপে, এত ভঙ্গিতে কর্ষণ করিয়াছেন যে তাঁহার হাতে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সকল দৈন্য ঘুচিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর তালিকা এখানে দেওয়া অসম্ভব, তাঁহার রচিত প্রধান কাব্যগুলির নাম 'সঞ্চয়িতা' অথবা 'চয়নিকা'র সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য। [৪০, ৪১, ৪২, ৪৩]

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯)—হুগলী জিলার চা
ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'নিধিবাবু' নামেই পরিচিত ছিলেন এবং
বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। ওস্তাদী 'আখড়াই'-গানের জন্য
গুণিসমাজে আদৃত হইলেও ইনি টপ্পা জাতীয় গান রচনা করিয়া জনপ্রিয় হ
ছিলেন: ইঁহার রচিত এই ধরণের গান উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা বলিয়াও গণ্য
হইতে পারে। [১১]

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়—(১৭১২-১৭৬০)—ব্রাহ্মণ জমিদার
বংশে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়; হুগলী জিলার (পূর্ব্বে
বর্দ্ধমান) অন্তর্গত হাওড়ার অদূরবর্ত্তী আমতার নিকট ভূরশুট পরগণার মধ্যে
পেঁড়ো গ্রামে জন্ম। ভারতচন্দ্র নিজ পৈতৃক বাসস্থা
এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া বাস
কাব্য রচনা করিয়া সেকালের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যা
কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহা
সাহিত্যিক রূপ ও বাংলা কাব্যকলা পুরাতন যুগের
আধুনিক কাব্যের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত
ছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যই
এই কাব্যখানি তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগকে নাম
দেওয়া যাইতে পারে; এই অংশে কবির কবিত্বের থাকিলেও
অশ্লীলতার দোষে ইহা আধুনিক সমাজে প্রচারযোগ্য নয় [৯, ১০]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১২৮৮-১৩২৯)—ইনি বিখ্যাত গদ্য লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র—পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের অন্যতম হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। খাঁটি বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়; এই দুই বিষয়ে তিনি অসামান্য রচনা কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন পুরাতন ভাষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন, তেমনই বহু নূতন বিদেশী শব্দের দ্বারা তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়াছেন। ছন্দের নিছক কারিগরিতে তিনি এ যুগের সকল কবির অগ্রগণ্য। তাঁহার কবিতায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ এবং আধুনিক কালের সমসাময়িক নানা তথ্য এমন ভঙ্গিতে এবং এমন যুক্তি ও ভাবুকতার সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে যে কেবল সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বাংল

ভাষায় গভীর জ্ঞান, ভাবুকতা ও পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মিয়া এবং রবীন্দ্র-শিষ্য হইয়াও প্রাচীন (ক্লাসিক্যাল) কাব্যরীতির পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার কবিতায় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—'তীর্থ-সলিল', 'কুহু ও কেকা' ও 'অভ্র-আবীর', মণি-মঞ্জুষা', 'বিদায়-আরতি' ও 'বেলাশেষের গান'। [৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৭-১৮৭৮)—যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী জগন্নাথপুর ইঁহার জন্মভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হয়। বাংলা-কাব্যের নবযুগের কবিগণের অন্যতম। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সাধনার আদর্শ অতিশয় স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কাব্যে নিছক কল্পনা বা কাব্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা—সমাজ, সংসার ও প্রকৃতির বাস্তব পরিচয় অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করিতেন; ইতিহাস, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনই তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শ ছিল; তিনি অতিশয় গাঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাষায় অতিশয় সারবান ভাব-চিন্তা কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি সেইরূপ রচনাতেও গভীর ভাবুকতার সহিত একপ্রকার কবিত্বের মিলন প্রায় দেখা যায়। 'মহিলা-কাব্য'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা; অন্যান্য কাব্য—'বর্ষবর্ত্তন', 'সবিতা-সুদর্শন' প্রভৃতি। [২৪]

———